BHARATE INGRAJ SHASAN

OR

BRITISH ADMINISTRATION IN INDIA.

(A book dealing with the benefits of the British administration in India in a way suited to the boys of High and Primary Schools.)

BY

SURENDRA NATH CHAKRAVARTY, M. A.,

Assistant Head Master, Metropolitan Institution (Bowbazar branch) and Examiner of the Calcutta University.

KAMALA BOOK DEPOT, LIMITED.

15, College Square,

CALCUTTA.

Annas Twelve.

প্রকাশক

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত

৭২ নং আমহার্ষ্ট রো,

কলিকাতা।

১৩২৯

কৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

এন, কে, বসু দ্বারা মুদ্রিত,

১৩নং মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার,

কলিকাতা।

ভূমিকা

ভারতে ইংরাজ শাসনের বৈশিষ্ট্য ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধান ; এই উন্নতির কথা কোমলমতি শিক্ষার্থীদিগের বোধগম্য ভাষায় সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করা লেখকের উদ্দেশ্য। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজরাজত্বে ভারতে সামাজিক, ধর্ম্মমূলক, নৈতিক শিক্ষা, শাসন, বিচার, ব্যবসায় বাণিজ্য, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নিকট যাহা একপ্রকার কল্পনা ছিল, ইংরাজ শাসনে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে ; এই সমস্ত বিষয় লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ছাত্র-সমাজে এই প্রকার একখানি পুস্তকের যে অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল, লেখক সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কি ছিল, কোথায় কি ভাবে কত প্রকার উন্নতি বিধান করা হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও অপরিজ্ঞাত ; অথচ এই বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করা সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক, বিশেষতঃ যে সকল ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শ্রদ্ধেয় এন্, এন্, ঘোষ মহাশয়ের

England's Works in India" নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের উপযোগী এতাদৃশ কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে পাঠ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহাদিগকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। লেখক সেই অভাব দূর করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থখানি তরলমতি বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

৭নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার কলিকাতা। } শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সূচিপত্র ।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ

ভারতে ইংরাজ শাসন

প্রথম অধ্যায়

———:*০*:———

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিবরণ।

আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত পালিত ও বৰ্দ্ধিত হইতেছি সেই দেশের নাম ভারতবর্ষ। অতি প্রাচীনকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহারই নামানুসারে এই দেশকে ভারতবর্ষ বলা হয়। ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘ আর পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রস্থেও প্রায় দুই হাজার মাই-লই হইবে। এই প্রকাণ্ডদেশে নানা ধর্ম্মের ও নানা জাতির প্রায় তেত্রিশ কোটি লোকের বাস। উহাদের আচার-ব্যবহার বেশ-ভূষা কথা-বার্ত্তাও আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নপ্রকার।

এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। এখানকার তুষারে আবৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত, বন্যজন্তুর আবাসস্থল বিরাট্ বন, বিশাল উত্তপ্ত মরুভূমি, নয়নাভিরাম নানাবিধ শস্যপূর্ণ প্রান্তর বক্রগতি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদনদী, অসংখ্য-প্রকারের বৃক্ষলতা কখনও দর্শকের মনে বিস্ময় কখনও শান্তি কখনও আনন্দ কখনও বা ভয় উদ্রেক করে। বাস্তবিক পৃথিবীর যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা কিছু আনন্দদায়ক সেই সমুদয় দ্বারাই যেন ভগবান্ আমাদের এই ভারতবর্ষকে গঠন করিয়াছেন। এই জন্যই অনেকে ইহাকে দেশ না বলিয়া মহাদেশ বলেন।

ভারতবর্ষ স্বভাবতই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুরক্ষিত।

ভারতের সীমা।

এই সুবিস্তীর্ণ দেশের উত্তরে বিশাল হিমালয় এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে অগাধ জলধি ইহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সতত রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষের এই প্রাকৃতিক অবস্থিতির জন্যই পূর্ব্বকালে অন্যদেশের লোকের পক্ষে এ দেশ আক্রমণ তত সহজসাধ্য ছিল না। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে "খাইবার" ও "বোলান" নামে যে দুইটি গিরিপথ আছে, সেই দুইটির অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই দিক্ দিয়া অন্য জাতির পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা একেবারে অসম্ভব হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"যা নাই ভারতে তা নাই জগতে"। বাস্তবিক জীবন-ধারণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক তজ্জন্য এদেশের অধিবাসীকে কখনও অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। লোকের জীবন ধারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের উর্ব্বরতা সাধন করিতেছে এবং নর্ম্মদা গোদাবরী কৃষ্ণা ও কাবেরী দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য মালভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই দেশকে "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" করিয়া রাখিয়াছে। কার্পাস, রেশম, পশম, তসর, নীল, লাক্ষা, চা, পাট প্রভৃতি নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত লৌহ, তাম্র, অভ্র, কয়লা প্রভৃতির অনেক খনি ভারতবর্ষে আছে। কোন কোন স্থানে স্বর্ণ হীরক এবং অন্যান্য নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরও পাওয়া যায়। এই জন্যই পূর্ব্বে লোকে ভারতবর্ষকে "সোণার ভারত" আখ্যা প্রদান করিত।

সম্পদ্ ও সমৃদ্ধি।

প্রাচীনকালে এই "সোণার ভারতের" অধিবাসিবৃন্দকে অভাব অনটনের তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে হইত না। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে তাঁহাদিগকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইত না। সেই-জন্য সেই সময়ে তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে ভগবচ্চিন্তা ও আত্মার

উন্নতি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। সেইজন্য প্রাচীনকালে শিক্ষায় ও সভ্যতায় কেহ ভারতের সমকক্ষ ছিল না। একদিকে যেমন ভারতের ধনসম্পত্তি ভারতকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল; অপর দিকে ইহা আবার তেমনই ইহার উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি যখন চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল তখন ধনলুব্ধ বৈদেশিকগণ নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া দলে দলে ভারতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসীকে কখনও জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। ফলে তাহারা একটু আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল; সেকারণ সহজেই তাহাদিগকে কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধপটু বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগের হস্তে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। এইরূপে ভারবর্ষকে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পর পর বহু বিজেতার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংরাজ জাতির ন্যায়দণ্ড ভারতকে সুশাসিত করিয়া রাখিতেছে। এক্ষণে ভারত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এই সাম্রাজ্য জগতের সকল সাম্রাজ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জগতে এমন কোন মহাদেশ নাই যাহার কোন না কোন অংশে ব্রিটিশ জাতি আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করেন নাই। সেইজন্য কথায় বলে, ইংরাজের রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না। জগতের স্থলভাগের পঞ্চমাংশই ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্গত

এবং কিঞ্চিদধিক একচতুর্থাংশ অধিবাসী ব্রিটিশ প্রজা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যিনি সম্রাট্, তিনি ভারত হইতে বহুশত মাইল দূরে ইংলণ্ডে বাস করেন। এই ইংলণ্ড ইউরোপের উত্তর পশ্চিমাংশস্থিত গ্রেটবৃটেন নামক দ্বীপের অন্তর্গত।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ডের ভৌগোলিক বিবরণ।

ইংলণ্ড বাঙ্গালা দেশের মতই নদীবহুল; অনেক নদনদী এই দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। এইখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। বিবিধ খনিজ দ্রব্যের জন্য এই দেশ প্রসিদ্ধ। কয়লা, লৌহ তাম্র, সীসা, টিন প্রভৃতি এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরস্থ বহু সমৃদ্ধিশালী বন্দর দেশ বিদেশ হইতে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করিয়া দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে। এই দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। নাতিশীতোষ্ণ দেশ বলিয়া এই দেশের অধিবাসিগণ উৎসাহী, উদ্যমশীল, কার্য্যক্ষম, সাহসী ও অধ্যবসায়ী। ইংলণ্ড চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিত; তজ্জন্য কোনও বৈদেশিক শত্রু সহসা এদেশ আক্রমণ করিতে পারে না। সমুদ্রতীরে অবস্থানের জন্য ইংরাজজাতি জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নৌবিদ্যা শিক্ষা করিবার অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে,

এইহেতু তাহারা নৌশক্তিতে এক্ষণে জগতের শীর্ষস্থানীয়। প্রধানতঃ এই শক্তির সাহায্যেই তাহারা জগতের সর্ব্বত্র তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখনই যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যখনই যেখানের শাসনভার ইংরাজজাতি গ্রহণ করিয়াছে তখনই সেখানে তাহারা শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দেশপ্রীতির উদ্রেক প্রভৃতি সম্পর্কে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। সেইখানেই তাহারা এমন কিছু একটা করিয়াছে, এমন নূতন এক ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছে যে, চিরদিন তাহাদিগের নাম সেই দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। ইংরাজজাতি ভারতবর্ষেও এইপ্রকার এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে, তজ্জন্য এইখানেও তাহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উহারা আমাদের দেশের কোন্ কোন্ বিষয়ে কিভাবে উন্নতি বিধান করিয়াছে তাহা জানিতে হইলে আমাদের ভারত ইতিহাসের পূর্ব্বাপর একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, একারণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হিন্দু আমল

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে যাহারা বাস করিত তাহারা এখনকার লোকের মত সুসভ্য ছিল না। উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যাঁহারা এই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইতিহাসে আর্য্যজাতি বলিয়া কথিত। উঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া এই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই আর্য্যরা দেখিতে গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন।

ভারতের বর্ত্তমান হিন্দুজাতি ইঁহাদেরই বংশধর। আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া প্রথমে সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হিন্দু নামে তাঁহারা অভিহিত হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে এই নামে আর্য্যগণ সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন আর্য্যগণের লিখিত পুস্তকাদি ব্যতীত তাঁহাদের ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। ইতিহাস হিসাবে তাঁহাদের সেই সমস্ত পুস্তক নিতান্ত নগণ্য হইলেও ইহা হইতেই তাঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, ও সেই সময়ের বিভিন্ন রাজ্যগুলির নাম প্রভৃতি জানিতে পারা যায়।

বেদ, ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতই তাঁহাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী।

উহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি আর্য্যগণ তখন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। প্রত্যেক সমাজেরই এক একজন রাজা থাকিতেন। কোনও কোনও স্থলে সমাজের সকলে মিলিয়া একজনকে রাজা করিতেন। রাজা সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের সাহায্যে ও আনুকূল্যে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন।

সমাজ।

সমাজের অনেকেই কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেন; আবার আবশ্যক হইলে কোন কোন সময়ে সকলে মিলিয়া অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন।

এখন যেমন যুদ্ধে বড় বড় কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা ছিল না। সে সময়ের যুদ্ধে সাধারণতঃ তীর, ধনু, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। পদাতিক ও রথী দুই প্রকার সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধ করা হইত। পিতা গৃহের কর্ত্তা ছিলেন। সেই সময়ে প্রত্যেক পরিবারেই অন্ততঃ একটি করিয়া গাভী প্রতিপালিত হইত।

আর্য্যগণের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না। সমাজে স্ত্রীলোকদের স্থান অতি উচ্চে ছিল। পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারাও নানা বিদ্যার আলোচনা করিতেন। শুনা যায় বেদের অনেক

আর্য্যসমাজে নারীর স্থান।

স্তব আর্য্যমহিলাগণ কর্ত্তৃক রচিত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, বিশ্ববরা, লোপামুদ্রা, অনসূয়া প্রভৃতি বহু বিদুষী আর্য্য-মহিলার কথা প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

বাণিজ্য ও শিল্প।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্য্যগণের অনেকেই কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এই বিষয়ে কেহ কেহ বিশেষ দক্ষ ছিলেন। বাণিজ্যাদি বিষয়েও আর্য্যরা বেশ উন্নত ছিলেন। তাঁহারা দেশের বিভিন্নস্থানে, এমন কি সময় সময় বিদেশেও নৌকার সাহায্যে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

তাঁহাদিগের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য-সমূহের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আদর ছিল। সমাজে তন্তুবায়, সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্পিগণের বিশেষ সম্মান ছিল।

প্রাচীন হিন্দুদিগের বর্ণভেদ।

আর্য্যগণ যখন প্রথমে সিন্ধুতীরে বসতি বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা ছিল না। কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন স্থানে বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে বর্ণভেদের সূত্রপাত হয়। একজনের পক্ষে সকল কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইলে অনেক সময় তাহার দ্বারা কোন কাজই ভালরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। সেই জন্য ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে এক এক শ্রেণীর উপর এক এক কার্য্যভার অর্পিত হইল। ক্রমে এই ব্যবস্থাই বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদের মূলকারণ হইয়া দাঁড়াইল।

যাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এবং যাঁহারা গৃহে থাকিয়া কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিতেন তাঁহারা বৈশ্য নামে পরিচিত হইতেন। আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভারতের যে সকল আদিম অধিবাসী আর্য্যদিগের পদানত হইয়াছিল তাহরা শূদ্র আখ্যা লাভ করিল। আর্য্যদিগের সেবা-শুশ্রূষা করাই শূদ্রের কর্ত্তব্য ছিল।

বর্ণভেদে দেশের অবস্থা।

বর্ণভেদের পর ক্ষত্রিয়গণই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশশাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যেই এক একজন রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

গ্রাম্যসমিতি।

সুশাসনের জন্য প্রত্যেক রাজা অধীন গ্রামগুলি একজন গ্রামণীর হস্তে অর্পণ করিতেন। কয়েকজন গ্রামণীর উপর আবার এক একজন নগরপতি থাকিতেন। উঁহারা গ্রামের বিশিষ্ট লোকদিগের পরামর্শে ও সাহায্যে নিজ নিজ বিভাগের শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। তাঁহারা বেতনস্বরূপ জমির শস্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। প্রজারা নিজেদের জমিতে উৎপাদিত শস্য বা ধনরত্নাদি রাজাকে করস্বরূপ প্রদান করিত।

সেই প্রাচীন যুগে রাজারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা

করিতেন। তাঁহাদিগের উৎসাহ ও উদ্যোগে তখন প্রত্যেক ঋষির আশ্রমই এক একটী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। শিষ্যেরা গুরুকে পিতার মত ও গুরুপত্নীকে মাতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তাহারা গুরুগৃহেই অবস্থান করিত ও ভিক্ষা করিয়া আপনাদের উদরান্নের সংস্থান করিত। এই সকল ব্রহ্মচারী কখনও কোন সময় গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠা বা শৈথিল্য প্রকাশ করিত না। তাহারা সহাস্যবদনে গুরুর সমস্ত আদেশই পালন করিত। তাহারা সর্ব্বদা বিনয়ী, নম্র, মিষ্টভাষী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিল।

শিক্ষা।

আর্য্যগণ বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মত নানাপ্রকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতেন না। তাঁহারা সূর্য্য অগ্নি বরুণ ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতির উপাসক ছিলেন। তবে তাঁহারা বিভিন্ন দেবতার আরাধনা করিলেও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর এক।

ধর্ম্ম।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বাপরই প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মান ছিল। হিন্দুসমাজে এখনও তাঁহাদের যথেষ্ট মান আছে। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। লোকের শিক্ষার ভারও তাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তখন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার অধিকার আর কাহারও ছিল না। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে

বুদ্ধদেব ও মহাবীর নামে দুইজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। উঁহারা দেশের সর্ব্বত্র সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন তখন হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদা নদীর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কোশল মগধ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ প্রাচীন কোশল রাজ্য। আর বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণ অংশ লইয়াই সাধারণতঃ প্রাচীন মগধরাজ্য গঠিত ছিল। মহাভারতের রাজা জরাসন্ধ এইখানেই রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্যে শিশুনাগ, মৌর্য্য, সুঙ্গ, গুপ্ত প্রভৃতি অনেক বংশ বহুবৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুরাজগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত আত্মকলহ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এই সুযোগে মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের অবস্থা।

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে রাজারা স্বয়ংই দেশ শাসন করিতেন।

শাসন।

তাঁহারা রাজধানীতে অবস্থান করিতেন। দূর দূরান্তের প্রদেশগুলির শাসনভার প্রতিনিধির উপর অর্পিত হইত। তাঁহারা রাজার আদেশ

অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কোন কোন স্থলে প্রজাতন্ত্র শাসনও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা শাক্যরাজ্যের উল্লেখ করিতে পারি। সেই রাজ্যে প্রজারাই আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে নায়ক মনোনীত করিয়া লইত। সেই নায়ক দেশের বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন।

সমাজ।

এই সময় সমাজের অবস্থা অত্যন্ত ভাল ছিল বলিয়া মনে হয়। তখনকার দিনে অন্নবস্ত্রের অভাব কাহাকেও ভোগ করিতে হইত না। কাজেই তখন দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ক্বচিৎ কোথাও চুরি ডাকাতি হইলে রাজা কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন।

সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত; কেহই অন্যের ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। সাধারণ লোক তখন সাধু ও সরল ছিল। জাল জুরাচুরী মিথ্যাচার প্রবঞ্চনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি কথার কথা ছিল। লোক সত্যপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, মিতব্যয়ী ও সরল ছিল। সমাজের লোকদিগের মধ্যে বিলক্ষণ সহানুভূতির ভাব দেখা যাইত। গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া একজনকে মণ্ডল নিযুক্ত করিত। মণ্ডল আবার কয়েকজন লোক লইয়া একটি সভা গঠন করিত। এই সভার সাহায্যে মণ্ডল অনেক গুরু ও

দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিত। গ্রামের করসংগ্রহ, বিবাদের মীমাংসা, সাধারণ অপরাধের বিচার, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন প্রভৃতি পল্লীসংস্কারের কার্য্যগুলি মণ্ডলরাই করিত। প্রজারা একেবারে রাজার নিকট কোনও অভিযোগ করিতে পারিত না। তাহাদিগকে মণ্ডলের সাহায্যে এই কাজ করিতে হইত। রাজার আদেশ প্রজাকে জানানও মণ্ডলের আর এক কর্ত্তব্য ছিল।

ধর্ম্ম।

এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব যে কোনও অংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা নহে। দুই ধর্ম্মই পার্শ্বচরভাবে ছিল। তখনও পরের ধর্ম্মে আঘাত করা রূপ ব্যাধি সমাজে প্রবেশ করে নাই। বৌদ্ধ রাজারা কখনও কাহাকেও জোর করিয়া বৌদ্ধ করেন নাই; হিন্দুরাও জোর করিয়া বৌদ্ধদিগকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করান নাই। মহারাজ হর্ষের পরে ভারতে রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লবও উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়; তাঁহার নাম শঙ্করাচার্য্য। তিনি পুরাতন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিয়া সমগ্র ভারতে বেদান্তের প্রচার করেন। তিনি শৈব ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন। পুরাণ ও তন্ত্র এই সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে থাকে।

এই যুগে শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল।

দেশের কোন রাজাই শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে কার্পণ্য করিতেন না। এই সময়ে কালিদাস, ভারবি,মাঘ, ভবভূতি, বাণভট্ট, ভর্ত্তৃহরি,দণ্ডী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবি ও লেখক তাঁহাদিগের অমর ছন্দে ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কনিষ্কের সময় চরক তাঁহার প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; সুশ্রুত নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। এই যুগে ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি মহাজ্ঞানীদের চেষ্টায় ও যত্নে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিত হয়। নালান্দা, তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তখন জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শনাদির অধ্যাপনা হইত। এতদ্ব্যতীত দেশে অসংখ্য টোল ও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল। পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। তবে কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়ও যে ছিল না তাহা নহে।

শিক্ষা।

এই যুগে শিক্ষার ন্যায় কুটীর-শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময়ে এদেশে তুলা ও রেশমের অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করা হইত। ঢাকার মসলিন সেই প্রাচীনকালের রোম প্রভৃতি তৎকালীন সভ্য-

শিল্প।

দেশে সমাদৃত হইত। এতদ্ব্যতীত ভারতীয়েরা স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর কারুকার্য্যখচিত জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ দক্ষ ছিল। সেই সময় চিত্র, ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যারও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

বাণিজ্য।

নানা প্রকার শিল্পকার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই যুগে বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় ভারতবাসীরা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মধ্য এসিয়া, কোচিন, জাপান, চীন, তিব্বত, আফ্রিকা, ইয়োরোপের রোম ও গ্রীস প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাইত। সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে এই যুগে ভারতবাসীরা শিক্ষাদীক্ষায় ব্যবসায়বাণিজ্যে শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

মুসলমান আমল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে হিন্দুরাজারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গজনীর রাজা মহম্মদ ঘোরীই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। তারপর কিঞ্চিদধিক তিন শতাব্দী পাঠান সুলতানগণ এদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের সময় রাজপুতনা মেবার প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক স্বাধীন হিন্দুরাজাও রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঠান সাম্রাজ্য।

দিল্লীতে পাঠান সুলতানগণ যে তিনশতকুড়ি বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অত্যাচার নিষ্ঠুরতা যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতিতে তাঁহাদের রাজত্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত। পাঠান-রাজগণ আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য যে বিচার-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা প্রজার সুখশান্তি ও বিবাদ-নিষ্পত্তির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাঁহারা এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেন না। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীনে কয়েকজন বিচারক নিযুক্ত থাকিতেন; এই সকল বিচারককে কাজী বলা হইত। তাঁহাদের বিচারের উপরে আর আবেদন নিবেদন বা আপীল ছিল না। প্রজার কর আদায় ও যুদ্ধকালিন সৈন্য সংগ্রহ করাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণের প্রধান কাজ ছিল। কৃষিকার্য্যই তখন জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। দেশে তখন টাকা পয়সার অভাব ছিল বটে কিন্তু সেই জন্য লোককে ভরণপোষণের জন্য কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হইত না।

তখন নিত্য নৈমিত্তিক জিনিষপত্র অতি স্বল্প মূল্যের ছিল। জনৈক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, তখনকার দিনে একমণ চাউল ৭ পয়সায় বিক্রয় হইত; একমণ ঘৃত এক টাকা সাত আনায় পাওয়া যাইত; ১৫গজ খুব ভাল কাপড় দুই

টাকায় মিলিত। এই সমস্ত সুবিধার জন্যই তখন জন-সাধারণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল।

শিক্ষা।

সেই সময়ে মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, ভক্তবীর নিমাই পণ্ডিত সেই সময়ে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ সেই সময়ে সুললিত বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষায় কবিতা লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন।

বাণিজ্য।

পাঠানদিগের রাজত্বকালেই ইউরোপের পোর্ত্তুগাল দেশের বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে সমুদ্র উপকূলে কালিকট নামক বন্দরে বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। আরব, চীন, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের বহু বণিক্ এইস্থানে বাণিজ্য ব্যপদেশে যাতায়াত করিতেন।

ধর্ম্ম।

পাঠান রাজত্বকালে মুসলমান পীর ফকির ও মোল্লাগণ হিন্দুদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার জন্য উপদেশ দিতেন। ফলে, অনেক হিন্দু তখন এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক রামানন্দ, কবীর, শিখগুরু নানক ও ভক্তবীর চৈতন্যদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোগল সাম্রাজ্য।

পাঠানদিগের পর এদেশে মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্য কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ে শিখ ও মারাঠাশক্তি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিল এবং তাহাদিগের চেষ্টা অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মোগলসম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতেই ভারতবর্ষে মোগলদিগের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ইহার প্রধান কারণ আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতি। আকবর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সেই সম্প্রীতির বিচ্ছেদ হয়। ফলে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে কয়েকজন বৈদেশিক আক্রমণকারীর আক্রমণে রাজকোষ ও সৈন্যবল ক্ষয় হওয়ায় এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে এদেশে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক ইংরাজ বণিক্ সম্প্রদায়ের উপর এই দেশের শাসনভার অর্পিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

মোগল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। তখন হিন্দুদিগকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। তাঁহারাও প্রাণপণ করিয়া সাম্রাজ্যের

অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। সামাজিক হিসাবেও উভয় জাতি পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগ করিত। অস্পৃশ্যতাদোষ তখনও ততটা প্রখর আকার ধারণ করে নাই। এমন কি, হিন্দু মুসলমান তখন বিবাহসূত্রেও আবদ্ধ হইত কিন্তু আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতি হিন্দু মুসলমানের এই মৈত্রী নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

মোগলদের সময়ে দেশের অবস্থা।

মোগল রাজত্বের সময় বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। অনেক স্থানে রাজার সাহায্যে মক্তব মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। এই সকল স্থানে আরবী পার্শী প্রভৃতি ভাষা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। সাহিত্যের বিশেষতঃ ইতিহাসের চর্চ্চা এই সময় অত্যন্ত অধিক ভাবে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে আবুল ফজল, কাফী খাঁ, ফেরেস্তা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দরাম, কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের অমর কবিতা এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তুলসীদাস ও তুকারাম এই সময়েরই লোক।

বিদ্যাশিক্ষা।

শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থপতিবিদ্যা এই সময়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সঙ্গীত চর্চ্চার দিকেও মুসলমান সম্রাট্গণ বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই সম্পর্কে অনেক গবেষণা ও নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

শিল্প।

বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ তানসেন এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মোগল রাজত্বের সময়ে বিশেষতঃ এই রাজত্বের শেষ সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা তত সুবিধাজনক ছিল না। মধ্যে মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব উপস্থিত হইত; ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারিত না। তবে এসময়ে ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিক্‌সম্প্রদায় ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায় পরিচালিত করিত। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ও ইংরাজের মধ্যে ব্যবসায় লইয়া মনান্তর হয়; তখন ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ছিলেন মহারাণী এলিজাবেথ। এই ব্যাপারে লণ্ডনের বণিক্-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে পৃথক্ ভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৬০০ খৃঃ অঃ ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতাভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করেন। ইংরাজদিগের পরে ফরাসীরা ভারতে আসেন। পর্ত্তুগীজরা ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং শীঘ্রই এই অঞ্চল হইতে তাহাদের বাণিজ্য উঠিয়া যায়।

ব্যবসা বাণিজ্য।

মোগল সাম্রাজ্যের সময়ে দেশে ধনরত্নের অভাব ছিল না বটে; কিন্তু তবুও সাধারণ লোকের অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। মোগল সম্রাট্‌গণ দেশের ধন সম্পত্তি আপনাদিগের

মধ্যেই বণ্টন করিয়া লইতেন। সাধারণ লোকের ভাগ্যে বড় বেশী কিছু জুটিত না। অনেক সময় অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেও কষ্ট হইত। কিন্তু সেজন্য কখনও কেহ অনাহারে মারা গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। রাজকর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত; সেইজন্য অনেকে অনেক সময় আপনাপন ধনসম্পত্তি ফেলিয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইত।

লোকের অবস্থা।

দেশের আইন কানুন মন্দ ছিল না। কিন্তু যাহাদিগের উপর এই আইন কার্য্যে পরিণত করিবার ভার অর্পিত হইত, তাহারা অনেক সময় উৎকোচ প্রভৃতি গ্রহণ করিত বলিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত না।

মোগলদিগের সময়ে ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার কৃষির অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইত। একারণ বাঙ্গালার অধিবাসিবৃন্দের অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালায় কয়েকজন বিশিষ্ট লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার অবস্থা।

ইংরাজ আমল।

ইংরাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ সুরাট নগরে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বহুকাল পর্য্যন্ত এইস্থান

ইংরাজদিগের বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা ছিল। তৎপরে সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়া ইংরাজদিগের সমগ্র ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার পক্ষে একটু সুবিধা করিয়া যান। কালক্রমে তাঁহাদের বাণিজ্যের যতই উন্নতি হইতে থাকে তাঁহারা ততই নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। পরিশেষে ভগবানের অনুগ্রহে একদিন ভারতের শাসনভার তাঁহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত হইল। ক্লাইব পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্লাইবের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি অনেকেই ভারত শাসন করিতে আসিয়াছিলেন। এই সকল শাসন-কর্ত্তাদিগকে গবর্ণর জেনারেল বলা হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন গবর্ণর জেনারেল তখন বাঙ্গালা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন হয়। লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনসময়ে এই দেশের অনেক প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এই সময়েই হয়।

পোষ্টাফিস, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি লর্ড ড্যাল-হৌসির অমর কীর্ত্তি। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ লর্ডক্যানিং যখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল তখন সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই ভীষণ বিদ্রোহের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কোম্পানীর হস্তে ভারতের শাসনভার রাখা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ

করিয়াই প্রজাবৃন্দকে নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। মহারাণীর এই ঘোষণা-পত্রের মর্ম্ম তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। বর্ত্তমানে মহারাণীর পৌত্র মহামান্য পঞ্চমজর্জ্জ ভারতের সম্রাট্।. তিনি মন্ত্রিসভার সাহায্যে দেশ শাসন করেন। যিনি ভারতের মন্ত্রী তাঁহাকে ভারতসচিব বলা হয়। বর্ত্তমানে লর্ড বার্কেনহেড এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ভারতের কার্য্যাদির জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। যখন যিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থাকেন, তিনি তাঁহার মনোনীত লোককে ভারতসচিবের পদ প্রদান করেন। ভারতসচিব ভারতীয় দপ্তরের কয়েকজন সদস্যের সাহায্যে ইংলণ্ডে বসিয়াই ভারত-শাসনের ব্যবস্থাদি করেন। ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলেই যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে এই দপ্তরের সদস্য হইতে পারেন।

বিহারের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিংহ (শ্রীযুত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ) ও বাঙ্গালার গৌরব পরলোকগত ভূপেন্দ্র নাথ বসু ভারত সচিবের দপ্তরের সদস্য ছিলেন। লর্ড সিংহ শুধু যে সদস্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি সেই পদ হইতে সহকারী ভারতসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর পদ দেওয়া হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন ভারতবাসী এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। প্রতিবৎসর ভারতের নৈতিক ও আর্থিক যে উন্নতি হয় ভারতসচিবকে পার্লামেণ্টের নিকট সেই সম্বন্ধে

এক বিবরণ দিতে হয়। এই সময়ে তাঁহাকে ভারতের আয়ব্যয় সম্বন্ধেও এক হিসাব পার্লামেণ্টে দাখিল করিতে হয়।

পার্লামেণ্ট।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য বিলাতে দুইটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের সভাকে "হাউস অফ কমন্স" বলা হয় এবং লর্ডদিগের ব্যবস্থাপক সভাকে "হাউস অফ লর্ডস" বলা হয়। এই দুইটি সভাই দেশের শাসন-সম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা প্রণয়ণ করে। এই উভয় সভায় যাহা সিদ্ধান্ত হয় রাজাকে তাহাতে সম্মতি দিতে হয়। রাজা পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রধান মন্ত্রীর উপর "হাউস অফ কমন্সের" আস্থা থাকে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। "হাউস অফ কমন্স" তাঁহার প্রতি আস্থাহীন হইলেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয। তিনি পদত্যাগ করিলে বিভিন্ন প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করিতে হয়; তখন রাজা আবার নূতন প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের আজ্ঞা দেন।

দেশীয় রাজা।

সম্রাট্ এই পার্লামেণ্টের সাহায্যে ভারতবর্ষ শাসন করেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ বলিলে শুধু গবর্ণর জেনারেল কিংবা তাঁহার অধীন রাজপুরুষদিগের দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষ বুঝায় না। প্রত্যুত

ইংলণ্ডের অধীন দেশীয় রাজন্য বা সামন্তবৃন্দের শাসিত প্রদেশগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। যে প্রদেশগুলিকে দেশীয় রাজ্য বলে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় সাত শত। এই রাজ্য-গুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে সকল রাজ্যের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে তাহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। নেপাল, হায়াদ্রাবাদ, মহীশূর, বরোদা, কাশ্মীর ও জম্মু এই শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলি গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের অধীন। গোয়ালীয়ার, ইন্দোর, ভূপাল, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, ভরতপুর, বিকানীর, আলোয়ার ও ধোলপুর প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য। যে রাজ্যগুলির সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎভাবে সম্পর্ক সেইগুলি তৃতীয় শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য। সিকিম, কুচবিহার, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, ভুটান, ময়ূরভঞ্জের রাজ্য এই পর্য্যায়ভুক্ত। যে সমস্ত দেশীয় রাজ্যের কথা বলা হইল তাহারা সকলে কোন না কোন প্রকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। তাহারা ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ কিংবা সন্ধি করিতে পারে না। এমন কি উহারা এসিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের কোন রাষ্ট্রশক্তির সহিত কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারে না। এই জন্যই একটা কথা আছে দেশীয় রাজ্যের কোন আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব নাই। দেশীয় রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলার কিংবা

অশান্তির উদ্ভব হইলে, ব্রিটিশ সরকার সামন্ত রাজাদিগকে ইহার প্রতিবিধান করিতে বাধ্য করিতে পারেন। তাঁহারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশ কিংবা অনুরোধ উপেক্ষা করিলে আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। এই জন্য সাধারণতঃ দেশীয় রাজ্যেও ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মত শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজিত।

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র।

১৮৫৭ খৃঃ অঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে এতদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। সম্প্রতি আমরা পার্লামেণ্ট নামক মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতের সম্পূর্ণ শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম। আমরা আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজাবর্গকে জানাইতেছি তাঁহারা যেন বিশ্বাসী রাজভক্ত হন। সকলেই যেন আমাদের ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণের অধীনতা স্বীকার করেন। যাঁহাদিগকে আমরা ভারত-শাসনে নিযুক্ত করিব তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের প্রতিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমরা চার্লস্ জন ক্যানিংকে ভারতের সর্ব্বপ্রথম রাজপ্রতিনিধি ও সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। অতঃপর তিনি আমাদের পক্ষ হইতে আমাদের নামে ভারত শাসন করিবেন। মধ্যে মধ্যে ভারত সচিব (Secretary of state for India)

তাহাকে যে সকল আদেশ করিবেন তাঁহাকে সেই সকল আদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যাঁহারা সাধারণ ও সামরিক বিভাগে কাজ করিতেন, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল না। তাঁহারা নিজ নিজ পদেই স্থায়ী রহিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহাদিগকে আমাদের ইচ্ছা ও নির্দ্ধারিত বিধি ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে হইবে।

আমরা দেশীয় রাজন্যবর্গকে জানাইতেছি যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে তাঁহারা যে সমস্ত স্বত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিল এবং ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহারাও যেন আমাদের সহিত তাঁহাদের সে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেন।

সম্প্রতি আমরা ভারতে আমাদের অধিকার বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু অন্য কেহ আমাদের অধিকার ও স্বত্বাদির উপর হস্তক্ষেপ করিলে, আমরা তাহা কখনও সহ্য করিব না। কেহ যদি অন্যায়ভাবে অপর কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহাও আমরা অনুমোদন করিব না।

আমরা আমাদের সাম্রাজ্যের অন্য প্রদেশের প্রজাবৃন্দের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিব ভারতীয় প্রজাবৃন্দের প্রতিও আমরা সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব। আমাদের সাম্রাজ্যের সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস ও

ধর্ম্মানুমোদিত নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে পারিবেন কেহই তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

শিক্ষা, যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ থাকিলে সকলেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সরকারী পদ প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা যখন দেশে কোন নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিব তখন আমরা ভারতের চিরাচরিত অধিকার ও আচার-পদ্ধতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতে যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যাহারা অন্যের কুপরামর্শে সেই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল তাহারা যদি এক্ষণে কর্ত্তব্যবোধে সেই পন্থা হইতে প্রত্যাগমন করে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করি। এতদ্ব্যতীত অপরাধ বিশেষভাবে প্রমাণিত না হইলে কাহাকেও দণ্ডিত করা হইবে না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহাতে এই স্থানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও দেশের কল্যাণজনক অন্যান্য কাজ হয় আমরা সেইজন্য বিশেষ যত্ন করিব। ভারতবাসিগণের সমৃদ্ধিই আমাদের শক্তি ; তাহাদের সন্তোষই আমাদের সর্ব্ব সঙ্কটের রক্ষাকবচ ; তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সপ্তম এডওয়ার্ডের ঘোষণা-পত্র।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া সাধারণ্যে এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ঘোষণা-পত্রেও তাঁহার মাতৃদেবীর ঘোষণাপত্রের মতই ভারতীয়দিগকে অভয়বাণী প্রদান করা হইয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্নিগ্ধ অঙ্কে আশ্রয় দেওয়া হইবে, এই সাম্রাজ্যের কেহ কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মবুদ্ধি ও অভিরুচি অনুসারে বিনা বাধায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারিবে, এই সমস্ত কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করাই এই ঘোষণা-পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন আমিও আমার মাতৃদেবীর পদাঙ্কানুসরণ করিব। তিনি যে প্রকার প্রজাবৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন আমারও সেই প্রকার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইবে না। আমি বেশ জানি আমার উপর যে গুরুকর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে তাহার নিষ্পাদনের উপর বহুলোকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে ; সুতরাং আমি এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইব॥

আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে কাহাকেও নিজ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস কিংবা ধর্ম্মের জন্য কোন প্রকার উৎপীড়িত উত্ত্যক্ত কিংবা অনুগৃহীত করা হয় নাই। সকলকেই দেশের আইন সমানভাবে রক্ষা করিয়াছে। ইহার পরেও এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় করা হইবে না। আবশ্যক হইলে দেশের অবস্থা অনুসারে নূতন আইন প্রণয়ন হইতে পারে বটে কিন্তু সেই সময়েও প্রজাবৃন্দের বর্ণ ও সম্প্রদায়গত আচারব্যবহার মতামতের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমি রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের আশ্বাসের জন্য বলিয়া রাখি, দেশে কোন প্রকার অন্যায় উদ্দেশ্যহীন দোষদুষ্ট ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইলে তাহার মূলোৎপাটন করাও আমার এক কর্ত্তব্য। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে এমন কাজে কখনও আমি কোন প্রকার উৎসাহ দিব না—দিতে পারি না। গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমার অভিষেকের সময় যে প্রকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, আবার আমি সেই প্রকার আদেশ দিয়াছি। আমি আদেশ করিয়াছি আমার বিচারালয়ের বিচারে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদিগের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস কিংবা একেবারে রহিত করা হউক। আমার ইচ্ছা, এই সকল অপরাধী ভবিষ্যতে যেন এই দয়ার কথা স্মরণ করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হয়, তাহারা আর যেন কোন অপরাধের অনুষ্ঠান না করে। সাধারণ কার্য্যে ভারতীয়দিগকে নিয়োগ করিবার সময় জাতিভেদ-জনিত অসুবিধা ধীরে ধীরে দূর করা

হইতেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও আশা করি যে, ভারতবাসিগণের শিক্ষাবিস্তার দূরদর্শিতাবৃদ্ধি এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে।

ভারতবর্ষে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমার প্রতিনিধি (Viceroy) ও গবর্ণর জেনারেল এবং অন্যান্য আমাত্যগণের বিশ্বাস সাবধানতা-সহকারে ঐ প্রথা বিস্তৃতি সাধন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। [ভারতবাসীদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক অধিকার ও শাসন-কার্য্যে অধিকতর ক্ষমতা-প্রাপ্তির জন্য দাবী করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই প্রকার দাবী কিয়দংশে পূর্ণ করিলে বর্ত্তমান রাজশক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবে না। যাঁহারা শাসন শক্তি পরিচালনা করেন, তাঁহারা যদি শাসিত-দিগের এবং তাহাদিগের উপর যাহাদিগের প্রভাব আছে, তাহাদিগের সহিত মিশিবার অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে শাসন-কার্য্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে।] এই উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থাদি হইতেছে তাহা আমি এক্ষণে প্রকাশ করিব না। কিন্তু শীঘ্রই ভারতবাসীদিগকে তাহা জানান হইবে। আমার বিশ্বাস এই সমস্ত ব্যবস্থা তাহা-দিগের বিশেষ কল্যাণজনক হইবে।

আমি ভারতীয় সৈনিকদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাদিগের সামরিক শক্তি ও শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কর্ম্মস্পৃহা যাহাতে

উপযুক্তরূপ আদৃত হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার একান্ত কামনা ছিল ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমি ভারতে গমন করিয়াছিলাম। তারপর হইতেই আমি ভারতের নৃপতি ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়াছি। আমার সে ভাব কখনও ক্ষুন্ন হইবে না।

আমার প্রিয়তম পুত্র প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস সপত্নীক ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনিও ভারতের উন্নতি ও সুখের কামনা করেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমার উপর যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, সেই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে যে জ্ঞান ও পরস্পরের প্রতি সৌহৃদ্য আবশ্যক তাহা যেন ভগবানের অনুগ্রহে লাভ করিতে পারি।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণা

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড পরলোকগত হইলে পঞ্চমজর্জ্জ ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভারতবাসীকে প্রাণের মত ভালবাসেন। সেই ভালবাসা কাজে দেখাইবার জন্য তিনি সম্রাট্ হইয়া সপত্নীক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতপ্রীতির ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তিনি স্বয়ং ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করেন।

এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের মত এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া ভারতবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীর সুখ শান্তি ও উন্নতি বর্দ্ধন করা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমার পূর্ব্বাধিকারিগণ তাঁহাদিগের স্বত্ব ও বিশেষ অধিকার রক্ষার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই আদেশেরই আবার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। ভগবৎসমীপে আমার প্রার্থনা তিনি যেন আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সহায়তা করেন।

উপসংহারে আমি নৃপতিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের প্রতি আমার স্নেহপূর্ণ অভিনন্দন জানাইতেছি—

দিল্লী দরবারে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ উপরি উক্ত ঘোষণা প্রচার করেন তাহর পর গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে তিনি কয়েকটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আজ ভারতের সর্ব্বত্র নবজীবনের ও উৎসাহের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেছি। শিক্ষাই যে এই উন্নতির মূল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইহেতু দিল্লী নগরীতে আমার আদেশক্রমে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শিক্ষার বিস্তার ও

উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইবে।* ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই আমার অভিলাষ। শিল্পে কৃষিকার্য্যে এবং জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী সকল ব্যবসায়েই তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন ইহাই আমার অনুরোধ। পরিশেষে আমি রাজভক্তি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণাবলী পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করাই ব্রিটিশ রাজত্বের মূলমন্ত্র। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য ইংরাজরাজত্বে ভারতবর্ষে যে সমস্ত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে ভারতে সামাজিক, নৈতিক, অর্থমূলক শিক্ষামূলক ও শাসনসম্পর্কীয় অশেষ কল্যাণকর কাজ করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ।

ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মঘটিত ও সামাজিক প্রথাগুলির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সমাজানুমোদিত কার্য্যাদি করিতে পারে। কেহ এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান করিতে পারে না; করিলে আইন অনুসারে দণ্ডিত হয়। কিন্তু যে সকল আচার অশ্লীল, নৈতিক হিসাবে আপত্তিজনক ও বীভৎস সেই সকল সমাজে প্রচলিত হইতে দেওয়া কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। তাই ইংরাজ-রাজত্বে এই ধরণের প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই সম্পর্কে অনেকটা সাফল্য লাভও হইয়াছে। কিন্তু শাসনকর্ত্তৃপক্ষ কোন সময় দ্রুতভাবে কখনও কোন কাজ করেন নাই। যখনই কোন সমাজের কোন কুপ্রথা আপত্তিজনক ও ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া মনে হইয়াছে তখনই তাঁহারা সেই সমাজের নেতৃবৃন্দের তৎসম্পর্কীয় মতামত সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হঠাৎ কোন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া কোন প্রথার বা অনুষ্ঠানের লোপ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহারা শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ; দেশের যাহাতে ভাল হয়, যাহাতে মঙ্গল হয়, যে ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণ নৈতিক ও ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হয়, তাঁহারা সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু রক্ষণশীল জাতি ভারতবাসী সহজে কোন পরিবর্ত্তন চায় না। হঠাৎ কোন দেশাচার কিংবা ধর্ম্মগত কুসংস্কার-মূলক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলে তাহারা পাছে প্রাণে দুঃখ পায় এই আশঙ্কায় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদা অতিসন্তর্পণে ধীরে ধীরে দেশাচার ও সামাজিক প্রথার আবশ্যক পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহারা এত ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন যে চিন্তা করিলে তাঁহাদের রাজনীতিজ্ঞান ও লোকমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। এইজন্য তাঁহারা ভারতবাসী আপামর জনসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষে যে সমস্ত সমাজসংস্কারমূলক কাজ করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে হিন্দুজাতির সতীদাহ-প্রথা নিবারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সতী শব্দের প্রকৃত অর্থ পতিব্রতা বা ধর্ম্মশীলা নারী।

সতীদাহ।

অতি পূর্ব্বকালে যে সকল নারী স্বামীর মৃত্যুর পরে আপনাদিগের জীবন ভার বহন করা দুঃসাধ্য মনে করিয়া স্বামীর মৃতদেহের সহিত এক চিতাশয্যায় ভস্মীভূত হইতেন, তাঁহাদিগকে সতী আখ্যা

প্রদান করা হইত। কবে কিভাবে সমাজের মধ্যে এই প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস সংগ্রহ করা দুরূহ। শাস্ত্রানুসারে সতী পতির মৃত্যুর পরে চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারেন অথবা ইচ্ছা হইলে মৃতপতির সহগামিনী হইতে পারেন। স্বামীর সহিত সহমরণ স্ত্রীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে তাঁহাকে সহমরণ যাইতে হইবে, শাস্ত্রের কুত্রাপি এমন বিধি নাই। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথা এমন ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল যে, বিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক নিতান্ত নৃশংসভাবে স্বামীর মৃতদেহের সহিত সৎকার করা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তখন আর গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। ১৮০৫খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতের গবর্ণর জেনারাল তখন তিনি এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি আপীল আদালতের জজদিগের নিকট জানিতে চান হিন্দুধর্ম্মের সহিত এই সতীদাহ প্রথার কি সম্পর্ক; এই প্রথার উচ্ছেদ করিলে মূল হিন্দুধর্ম্ম কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবে কিনা। জজরা এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতগণের অভিমত সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থা ভিন্ন প্রত্যেক হিন্দুনারী স্বেচ্ছায় সতী হইতে

পারে। ইহার সহিত মূল হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ। অতঃপর জজেরা গবর্ণমেণ্টকে জানান যদিও এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে পারে, তথাপি ইহা অবিলম্বে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা সমীচীন নহে। ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে অতি সাবধানতার সহিত আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

তারপর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা কিয়ঞ্চিৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এই রাজাদেশ সাধারণ্যে প্রচার করা হয়।

ইংরাজ অধিকারে কোথাও কোন সতীদাহ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা প্রধান পুলিসকর্ম্মচারীকে জানাইতে হইবে। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, যে নারী মৃত স্বামীর সহগামিনী হইতে উদ্যত হইয়াছে, সে বাস্তবিক স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে কিনা। তাহার যদি বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহাকে যদি কোন প্রকার উত্তেজক বা মত্ততাজনক দ্রব্য সেবন করান হইয়া থাকে, অথবা সে যদি গর্ভবতী হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ। সেই আদেশপত্রে এ কথাও বলা হইয়াছিল যে,পুলিসের সাক্ষাতে সতীকে মৃত স্বামীর অনুগমন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে কোন ভয় অথবা প্রলোভন প্রদর্শন কিংবা বলপ্রয়োগ না হয়, পুলিস কর্ম্মচারী সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া সতীদাহের অনুমতি দিতে পারিবে।

সরকারের এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল। এই রাজাদেশে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। অতঃপর ১৮২৩খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট সহমরণকে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এ কথাও জানাইয়া দেন যে, যে নারী মৃত স্বামীর অনুগমন করিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহাকে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে অভিপ্রায় জানাইতে হইবে। কিন্তু যে পরিবারে এই সহমরণ ঘটিবে সে পরিবারের কোন লোক কখনও সরকারী চাকুরী প্রাপ্ত হইবে না। অধিকন্তু সেই সতীর ও তাহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

লর্ড আমহার্ষ্টের এ ব্যবস্থাও আশানুরূপ ফলপ্রদ হইল না। অতঃপর ১৮২৯খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক রাজবিধি প্রণয়ন করেন (Regulation XVII of 1829)। ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় যে, জীবিত কোন হিন্দু বিধবাকে মৃত স্বামীর সহিত একসঙ্গে দগ্ধ করিলে কিংবা দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবে। সরকারের এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই এই দেশে সতীদাহ প্রথা রহিত হইতে আরম্ভ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়।

পূর্ব্বকালে চড়ক পূজায় এক প্রকার বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত

হইত। এখনও যে উহার সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়াছে, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

বাণফোঁড়া। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়কপূজা হয়। পূর্ব্বকালে এই দিনে হিন্দু সন্ন্যাসীরা উচ্চ মঞ্চ হইতে লৌহকণ্টক ও ছুরিকার উপর ঝম্প দিয়া পড়িত। তাহারা তাহাদের হস্ত জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিত। অনেকে আবার উত্তপ্ত বর্শা শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিত। আবার কেহ কেহ পৃষ্ঠে মেরুদণ্ডে আংটী লাগাইয়া ঝুলিতে থাকিত। সে এক বীভৎস কাণ্ড। ইহাতে জীবননাশের আশঙ্কাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেইজন্য এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তদানীন্তন বঙ্গের ছোট লাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (Sir Frederic Halliday) এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই ব্যাপারের মধ্যে কোন প্রকার জোর জুলুম নাই। হিন্দু সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই প্রকার লোমহর্ষণ কাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। সুতরাং ইহার প্রতিকার করা শিক্ষক ও মিশনারি-দিগের পক্ষে সহজসাধ্য। তাঁহাদিগের উপদেশে সন্ন্যাসীরা এই প্রকার ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন। রাজবিধি অপেক্ষা নৈতিক বলেই ইহা নিবারিত হওয়া উচিত।

সেই কালের জনসাধারণ এতটা কুসংস্কারাপন্ন ছিল যে, শিক্ষক ও মিশনারিদিগের উপদেশে কোন কাজ হইল না।

অতঃপর স্যার জন গ্রাণ্ট এই বিষয় অবহিত হন। তিনি প্রাদেশিক কমিশনারগণের রিপোর্ট অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেক শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যেন সেই স্থানের জমিদারগণের সাহায্যে ও আনুকূল্যে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা করেন। সকলকে যেন এই বীভৎস কাণ্ডের অনিষ্টকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলেই তাহারা স্বেচ্ছায় এই প্রথা পরিহার করিবে। কোন কোন স্থলে পুলিশকে এই সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে বলা হইল। অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট স্যার সিসিল বীডন বঙ্গদেশের সকল ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেন যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। যাহারা তাঁহাদের আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিবে তাহাদিগকে যেন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই ব্যবস্থার পর হইতেই এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

সতীদাহ নিবারণ ও বাণফোঁড়া প্রথা বন্ধ এই দুইটী সামাজিক সংস্কার ব্রিটীশ রাজত্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দুটী ব্যাপারে শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ যে প্রকার ধীরতা সহকারে আবশ্যক ব্যবস্থাদি করিয়াছেন তাহাতে ইহা বিশেষভবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লোকের সামাজিক কিংবা ধর্ম্মগত রীতি নীতি আচার পদ্ধতি সম্পর্কে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে চান না। কিন্তু যেখানে লোক-

সমাজ এ সকল কুপ্রথা নিবারণে নিতান্ত অক্ষম কিংবা উদাসীন কেবল সেই স্থানেই গভর্ণমেণ্ট অগত্যা স্বয়ং এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। সতীদাহ ও বাণফোঁড়া নিবারণ সম্পর্কে অতর্কিতভাবে গভর্ণমেণ্ট কিছু করেন নাই। সর্ব্বপ্রথম লোকসমাজের উপরেই ইহাদের প্রতিকারের ভার অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু লোকসমাজের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া আইন করিয়া উহা বন্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে একদিনের মধ্যেই উহা তুলিয়া দিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। লোকের গার্হস্থ্য সামাজিক বা ধর্ম্মগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা যেমন ইংরাজ শাসন-নীতির বৈশিষ্ট্য আবার তেমনি বীভৎস কুপ্রথাগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাও ইংরাজ শাসননীতির বিরোধী। তবে তাঁহারা কোন সংস্কার কার্য্যেই অতিমাত্র ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন নাই।

শিশুহত্যা।

যখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেই সময় হইতেই এই দেশে শিশুহত্যা প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। এই কুপ্রথার এমনি বিষম ফল ফলিয়াছিল যে, স্নেহশীলা জননীরা পর্য্যন্ত তাহাদের নবজাত শিশুকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিত। তাহারা দেবদেবীর নিকট কোন বিষয় কামনা করিয়া এবং কোন কোন সময় প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া তাহার প্রতিদানস্বরূপ এই

প্রকার বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত করিত। সেই যুগে কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ পঞ্জাবে, যুক্তরাজ্যে এবং রাজপুতনায় বর্ত্তমানের বাঙ্গালার মত মেয়ের বিবাহ এক বিষম ব্যাপার ছিল। সেইজন্য তখন সেই সমস্ত স্থানে কন্যা সন্তান জন্মিবা-মাত্র তাহাকে হত্যা করার চেষ্টা হইত। অনেক স্থলে অনেকে এই প্রকার পৈশাচিক কাণ্ড করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন।

এই সমস্ত ব্যাপার এমনই ভয়ানক ও লোমহর্ষণ যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেশী দিন এইদিকে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। সরকার জন্মমৃত্যু রেজেষ্টারী প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া ও ফৌজদারী আইনের বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা ইহার বিলোপ সাধন করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে অতি নগণ্য শিশুকেও হত্যা করিলে ফাঁসি যাইতে হয়। এমন কি জীবিত শিশুর দেহের কোন অংশ মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হওয়ার পরেও যদি এই প্রকার ব্যাপার ঘটে তাহা হইলেও অনুষ্ঠাতা হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইবে।

সেই প্রাচীন যুগে এক সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন যাঁহারা মন্ত্রশুদ্ধির উদ্দেশ্যে নরবলি দিতেন। তাঁহাদিগকেও আইনের শাসনে বাধ্য হইয়া এইপ্রকার অমানুষিক কার্য্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। অবশ্য এখন আর যে শিশুহত্যা বা নরবলি কোথাও হয় না বা হইতে পারে না এমন কথা আমরা জোর করিয়া বলি না। তবে এখন আর কেহ

অধিকারের দাবীতে কল্পিত ধর্ম্মের ভান করিয়া প্রকাশ্যভাবে এই প্রকার বীভৎস কাণ্ড সংঘটন করিতে পারে না। তবে কোন দুর্বৃত্ত যদি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই কার্য্য করে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইলেই তাহাকে আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে হয়।

পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ উচ্চবর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আইনবিগর্হিত ছিল। নিজের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর বিধবাগণ আবার বিবাহিতা হইতে পারিতেন না। ইহা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদিগের স্বাধীনতার পরিপন্থী সমাজের এই কুসংস্কারমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে সমাজকে দেখাইয়া দেন যে স্থলবিশেষে বিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। এই শাস্ত্রসম্মত কার্য্যকে দেশের আইন-অনুমোদিত করিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধের ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে হিন্দু বিধবা বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং এই বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহাকেও বৈধ সন্তান বলিয়া গণ্য করা হইবে।

বিধবা-বিবাহ।

ইংরাজাধিকারে আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য

সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছে; পূর্ব্বে হিন্দুজাতির মধ্যে কেহ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণের জন্য সে ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এমন কি, পৈতৃক সম্পত্তি দখল করিবার পরেও যদি সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত, তাহা হইলেও সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকিত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মান্তরগ্রহণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক আইন প্রণয়ন হয়। উহাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, সকলেই নিজের অভিরুচি অনুসারে সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহাকেও কোন প্রকার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না। ধর্ম্মসম্পর্কে এই প্রকার উদারতা প্রকাশ করা ইংরাজ রাজত্বের আর একটা বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ।

উল্লিখিত সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট আরও কতগুলি এমন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কেহ কখনও কাহারও শীলতা নষ্ট করিলে কিংবা কাহারও নৈতিক চরিত্রে আঘাত প্রদান করিলে তাহাকেও দণ্ডিত হইতে হয়। প্রকাশ্য স্থানে কোনপ্রকার কুৎসিত ব্যবহার, আপত্তিজনক গান কিংবা অশ্লীল পুস্তকাদি বিক্রয় করিলে আইন অনুসারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়।

একদিকে গভর্ণমেণ্ট যেমন নানাপ্রকার আইন বিধিবদ্ধ

করিয়া, সামাজিক দুর্নীতি নিবারণের সহায়তা করিয়াছেন।

শীলতা রক্ষা।

তেমনই আবার অন্যদিকে তাঁহারা এই সকল বিষয়ে লোকের যাহাতে অরুচি জন্মে, দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তার করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা শিক্ষাসম্পর্কে ছাত্রবৃন্দের অবশ্য-জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা বলিব।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা।

মানুষ ও পশুতে প্রভেদ অতি অল্প। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ আপনার দায়িত্ব উপলব্ধি এবং মনোবৃত্তির উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারে ; পশু তাহা পারে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

সেইজন্য শিক্ষার দ্বারা মানুষ পশু হইতে পৃথক্ হয় ; এবং এই জন্যই সভ্য সমাজে শিক্ষাকে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া গণ্য করা হয়। শিক্ষা মানবজীবনের প্রধান সম্বল। শিক্ষা ব্যতীত মানব মানব নামের যোগ্য হইতে পারে না। শিক্ষার গুণে আমরা লৌকিকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দয়াদাক্ষিণ্য, পরোপকার, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণাবলী লাভ করিতে পারি।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষার তারতম্য।

পুরাকালে আমাদের দেশে নগর ও গ্রাম হইতে দূরে বিস্তীর্ণ অরণ্যানী অবস্থিত ছিল ; সেই সকল অরণ্যে আর্য্য-দিগের অধ্যাপক ঋষিগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের নামে বহু দূর দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেন। উপদেষ্টা ঋষিগণ ধ্যান, ধারণা এবং শাস্ত্রচিন্তার পর অবশিষ্ট সময় অধ্যাপনায় ব্যয় করিতেন। শিষ্যগণ গৃহ হইতে আগমন কালে কিছুই সঙ্গে আনিতেন না। ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যই তাঁহাদের জীবন-

রক্ষার উপায় ও গুরুর পরিচর্য্যাই একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। সেই সময় জ্ঞানই ছাত্রদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতীয় প্রাচীন প্রথাকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। অনেকে বলেন, এই শিক্ষা-পদ্ধতি পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা কোন কোন অংশে উন্নত ছিল। প্রাচীন শিক্ষা একেবারে স্বার্থের গন্ধ পরিবর্জ্জিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু শেষোক্ত শিক্ষা একমাত্র পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই উৎসাহিত করিত। পৌরাণিক যুগে শিক্ষা-প্রণালীর কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলেও প্রাচীন আর্য্য এবং বৌদ্ধ প্রথাই তাহার আদর্শ ছিল। মুসলমান অধিকার কালে রাজার সাহায্যে সর্ব্বজনীন শিক্ষার তেমন কোন বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন সম্প্রদায় সেই প্রাচীন প্রথার আদর্শ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। অন্যেরা সুযোগ ও সামর্থ্য অনুসারে আরবী, পার্শী প্রভৃতি রাজার ভাষা শিক্ষা করিয়া রাজকীয় কার্য্যের উপযুক্ততা লাভ করিত। এই সময় সর্ব্বজনীন শিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকিলেও দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে অসভ্য বন্যজাতীর পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে। জাতি-

বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আজকাল সকলেই সকল প্রকার শিক্ষা লাভ করিতে পারে; কাহাকেও সেজন্য কোন বেগ পাইতে হয় না। ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া আমরা এখন পৃথিবীর সকল তত্ত্বই জানিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; হিন্দু রাজত্বের সময় এদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই বিশেষভাবে চর্চ্চা হইত। সেই সময়ের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও তৎকালোপযোগী মার্জ্জিত ছিলেন। তবে আজ কালের মত তখন আপামর জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তখন উচ্চ শিক্ষা সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ সহজসাধ্য শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কাজে আত্মনিয়োগ করিত। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা তখন অনেকের মনেই উদিত হয় নাই। কাজেই তখন বর্ত্তমান যুগের মত নিম্নশিক্ষার এত বিস্তার ছিল না।

হিন্দু রাজত্বের শিক্ষা।

হিন্দু রাজত্বের সময় টোলপ্রথায় ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত। এক এক টোলে এক এক জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রগণকে এক এক বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। ইংরাজ শাসনের ন্যায়

টোলপ্রথা।

সেই সময়ে স্কুল কলেজের সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের নিয়ম ছিল না। সেই সময়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত না। টোলে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ শুধু ব্রাহ্মণ ছাত্রগণকেই সাধারণতঃ শিক্ষা দান করিতেন। অনেক অধ্যাপকই কেবল এক বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকিতেন। সুতরাং তাঁহারা কেবল সেই এক বিষয়েই শিক্ষা দিতেন। ছাত্র-গণকেও বাধ্য হইয়া এক বিষয়ের শিক্ষাই অর্জ্জন করিতে হইত। তবে তাহারা অভিরুচি অনুসারে অধ্যাপক মনোনীত করিত। যে বিষয়ে যে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিত, সে সেই বিষয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভের জন্য যাইত।

মুসলমান রাজত্বের শিক্ষা।

হিন্দু রাজত্বের পর মুসলমানগণ এই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাহাদিগের সময়েও শিক্ষা সর্ব্বতোমুখী হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং তখন নিম্নশিক্ষা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইত বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে আরবী ও পার্শীভাষা উচ্চবংশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। তাঁহারা এই ভাষা মনোযোগসহকারে শিক্ষা করিতেন। এইজন্য কোন কোন স্থানে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্তবংশের মুসলমানগণই সাধারণতঃ এই সমস্ত মক্তবে পাঠ অভ্যাস করিতেন। গৃহ-বিবাদের জন্য মুসলমান সম্রাট্‌গণ জনসাধারণের উচ্চ শিক্ষার প্রতি তেমন ভাবে খর দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে

দুই একজন হিন্দু বা সাধারণ মুসলমান নিজেদের চেষ্টায় আরবী ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেন বলিয়া উঁহাদিগকে মুন্সী আখ্যা প্রদান করা হইত। উঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিও উচ্চ রাজপদ লাভের আশায় এই সকল বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখনও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোথাও বর্ত্তমান কালের মত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তখন জনসাধারণকে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। এইজন্য কোন প্রকার সুবিধাজনক পন্থাই তাহাদের নিকট উন্মুক্ত ছিল না।

মুন্সী।

ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষাসম্পর্কীয় এই অসুবিধা বিশেষভাবে দূরীভূত হইয়াছে। এখন লোক ইচ্ছা করিলেই অতি সহজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ নিরস্ত হয়েন নাই। উহাদিগকে স্থায়ী করিবার জন্য অনেক স্থানে সরকার পক্ষ হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাকে "গ্রাণ্ট-ইন-এড" বলে। অবস্থাভেদে আবার অনেক স্কুল কলেজকে সরকার হইতে এককালীন দান করা হয়। এককালীন দানকে "ডোনেশন" (Donation) বলে। এই সমস্ত স্কুল ও কলেজ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত করিবার জন্য নানা-

ইংরাজ রাজত্বের শিক্ষা।

প্রকার বিধিব্যবস্থাও প্রণয়ন করা হইয়াছে। সেই সমস্ত নিয়মানুসারে যাহাতে কাজ হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষিত কর্ম্মচারীকে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগ।

এক এক প্রদেশের শিক্ষার ভার এক এক জন ডিরেক্টরের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার কাজের সাহায্যের জন্য তিনি সহকারী পান। তাঁহাকে এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর বলে। অভিজ্ঞ এবং উচ্চশিক্ষিত লোকদিগকেই সাধারণতঃ এই পদ প্রদান করা হয়। ডিরেক্টর শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা। এক এক প্রদেশে এক একজন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর থাকেন। পূর্ব্বে খাস বাঙ্গালায় এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে দুইজন ডিরেক্টর ছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের "ভগ্নবঙ্গ" আবার "পুনর্মিলিত" হওয়ায় সেই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন একজন ডিরেক্টরই উভয় প্রদেশের শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্য্যাদি পরিচালিত করেন। বর্ত্তমান সময়ে মিঃ ওটেন এই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত। বহুদিন এই বিভাগে কাজ করিয়া তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

ইন্‌স্পেক্টর।

ডিরেক্টরদিগের অধীন এক এক বিভাগে (Division) এক এক জন উচ্চ শিক্ষিত ইন্‌স্পেক্টর থাকেন। তাঁহারা ডিরেক্টরের অধীন থাকিয়া স্কুলগুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রতি জেলায় তাঁহাদিগের অধীন অবস্থা-

ভেদে এক বা ততোধিক ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরদিগের অধীনে আবার সব-ইন্‌স্পেক্টর ও এসিষ্টাণ্ট সব-ইন্‌স্পেক্টরগণ স্কুল ও পাঠশালা পরিদর্শনে সাহায্য করেন। এইপ্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে স্কুল-পাঠশালা-গুলির পরিদর্শন কার্য্যাদি পরিচালিত হওয়ায় কোথাও কোন প্রকার অনিয়ম কিংবা বিধি-বহির্ভূত কার্য্য হইতে পারে না। স্কুলের মত কলেজবিভাগেও ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া কলেজের কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করেন।

স্কুলের সাম্যভাব।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই শিক্ষা প্রদান করা হয়। যে কোন জাতি, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী নির্ব্বিবাদে সরকারী কিংবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে। ইংরাজরাজত্বে জাতি-বিশেষের কোন প্রকার একাধিপত্য নাই। শিক্ষালাভ বিষয়ে আজকাল সকলেরই সমান অধিকার। বিদ্যামন্দিরে জাতিগত বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। ফলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহানুভূতি ও ভালবাসার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা।

ছাত্রগণের কি প্রকার শিক্ষা হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যে সকল ছাত্র স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারে, সরকার হইতে তাহাদিগকে

বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। কত মেধাবী দরিদ্র ছাত্র গবর্ণমেণ্টের এই ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা ইয়ত্তা নাই।

শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ।

শিক্ষাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ—(১) আদ্য বা প্রাথমিক (Primary), (২) মধ্য (Secondary), (৩) এবং উচ্চতর (Higher)।

যে সকল বিদ্যালয়ে বালকগণকে প্রাথমিক পাঠ্যাদি (বর্ণপরিচয় প্রভৃতি) শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত বিদ্যালয়কে আদ্য বা প্রাথমিক (Primary) বিদ্যালয় বলে। এই

প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য সর্ব্বত্র সমান নহে। দেশের অবস্থাভেদে উহা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মাতৃভাষায় পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে বালকেরা সামান্য (তেরিজ জমা-খরচ প্রভৃতি) সাধারণ অঙ্ক আয়ত্ত করিতে পারে, ভূগোল, কৃষি-বিদ্যা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ভারতের ইতিহাস -বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদান করিবার নিয়ম। প্রায় সকল স্থানেই এই প্রকার দুই একটা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল পাঠাশালার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই সাক্ষাৎ-ভাবে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির উপর

অর্পিত। প্রতি বৎসর প্রতি জেলার নিম্ন শিক্ষার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি বহু হাজার টাকা ব্যয় করেন।

মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয়।

মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহ (Secondary Schools) তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়, (২) মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও (৩) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। প্রাথমিকবিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, মধ্য বাঙ্গালা স্কুলেও সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে ছাত্রদিগকে শিখান হয়। মধ্য ইংরাজী স্কুলের ও মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিভিন্নতা নাই। তবে মধ্যইংরাজী স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বঙ্গ ভাষার সাহায্যেই ছাত্রদিগকে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হয়। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এই স্থান হইতে ছাত্রেরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে প্রবিষ্ট হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে ছাত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, পাটনা, ঢাকা, রেঙ্গুন, নাগপুর ও লক্ষ্ণৌ এই কয়েকটী স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এতদ্ব্যতীত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলেম বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়েকটা বিশ্ববিদ্যা-লয় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনে এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষাদানের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্কুল ও কলেজের শেষ পরীক্ষার ও পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচনের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত নিয়মানু-সারে স্কুল ও কলেজকে চলিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনু-মোদিত কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রের পরীক্ষা গৃহীত হয় না। ইহার এক সাধারণ সভা আছে, তাহার নাম "সিনেট"। কার্য্যনির্ব্বাহার্থে এক সভা আছে, সেই সভাকে "সিণ্ডিকেট" বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকে "চান্সেলার" বলে। প্রাদেশিক গবর্ণরগণই সাধারণতঃ "চান্সেলার" থাকেন। তাঁহার সহকারীকে "ভাইস্ চান্সেলার" বলে। পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "চান্সেলার" ছিলেন স্বরং ভাইস্-রয় বা রাজপ্রতিনিধি। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "চান্সেলার"। বাঙ্গালার গৌরব-রবি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বহুবৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারই চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পড়িয়াছে। সার আশুতোষের পরলোকগমনের পর নীরব কর্ম্মী সর্ব্বজনমান্য পরোলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু "ভাইস্-চান্সেলারের" গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি অধিকদিন এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন নাই। কাল তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি মান্যবর মিঃ গ্রীভস্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস্-চান্সেলার" হইয়াছেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক। তাঁহার পরিচালনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইবে, এমন ভরসা আমাদের আছে।

অধ্যয়নের নির্দ্ধারিত সময়।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ছাত্রদিগকে অবস্থা অনুসারে বার বৎসর, চব্বিশ বৎসর, ছত্রিশ বৎসর, কাহাকেও কাহাকেও বা আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্তও বিদ্যাশিক্ষায় যাপন করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে মেধাবী ছাত্রেরা পনর ষোল বৎসর পরিশ্রম করিলেই সাধারণ বিভাগের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারে। এক এক স্কুলে সাধারণতঃ নয়টা ক্লাস থাকে। তাহাতে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা অনুসারে নয়জন কি ততোধিক শিক্ষক থাকেন। প্রায় সকল স্কুলেই বিভিন্ন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয় পড়াইতে হয়। ইহাতে ছাত্রগণের শিক্ষার অনেক

সুবিধা হইয়া থাকে। এই ভাবে মেধাবী ছাত্রেরা নয়বৎসরে স্কুলের পাঠ্য শেষ করিয়া কলেজে প্রবেশ লাভ করে। কলিকাতা ও ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে পনর বৎসর পূর্ণ না হইলে ছাত্রেরা স্কুলের শেষ পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন দিতে পারে না। কলেজে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদিগকে দুই বৎসর আই, এ : দুই বৎসর বি, এ ; দুই বৎসর এম, এ, ও তিনবৎসর বি, এল, পড়িতে হয়। তবে এম, এ, ও বি, এল একই সময়ে পড়া যায়

কলেজে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য, বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, ইতিহাস, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, খনিবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, ন্যায়-শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার এমন সুন্দর বন্দো-বস্ত ইতঃপূর্ব্বে ভারতে কখনও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ফলে ভারতবাসী ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া সমধিক সভ্য ও উন্নত জাতিতে পরিণত হইতেছে। তাই এক্ষণে ভারতীয় আপামরজনসাধারণের মধ্যেই স্বাধী-নতার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই স্পৃহার উদ্রেক করাই ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শাসনের উদ্দেশ্য কতকাংশে সিদ্ধ হইয়াছে।

সাধারণ শিক্ষার বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হন নাই। যাহাতে দেশমধ্যে ব্যবসায়গত ও কার্য্যকারী শিক্ষার প্রচলন হয়, সেই জন্যও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা

করিতেছেন। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যাধি হইতে মুক্তি-লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় নিয়মাদি প্রতিপাল্য, অপরদিকে আবার তেমনই সুচিকিৎসকের আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই দেশের স্থানে স্থানে মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা পাশ করিলে ছাত্রদিগকে মেডিকেল কলেজে ও মেডিকেল স্কুলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, গত কয়েক বৎসর যাবৎ অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ লাভ করা দুঃসাধ্য না হইলেও একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলে পূর্ব্বে "এল্, এম্, এস্," বা অবস্থাভেদে "এম্, বি," উপাধি প্রদান করা হইত। কিন্তু এক্ষণে শুধু "এম্, বি," উপাধি দেওয়া হয়। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই লক্ষ্ণৌ ও লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উপাধি প্রদান করিতে পারে।

মেডিকেল স্কুল ও কলেজ।

মেডিকেল কলেজ ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সার্ভে স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, আর্ট স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াও গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর শিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। এই সকল কলেজে ও স্কুলে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়া নানাবিধ জ্ঞানলাভ করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

ইহাতে তাহাদিগের যথেষ্ট অর্থাগমেরও সুযোগ ও সুবিধা হয়।

আইন কলেজ।

ছাত্রগণ যাহাতে আইন অধ্যয়ন করিতে পারে, সেইজন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনেক আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বি, এ, পাশ করিয়া ছাত্রগণ এই সকল কলেজে প্রবিষ্ট হইতে পারে। তাহা-দিগকে তিনবৎসর আইন পড়িতে হয়। আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা আইন ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইতে পারে। পূর্ব্বে বি, এ, পাশ না করিয়াও আইন পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারিত কিন্তু এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই।

বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্র।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অলোচনা ছিল বটে; কিন্তু মধ্যে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আবার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা হইতেছে। এক্ষণে বিজ্ঞান ভারতবাসীর একটা প্রধান পঠনীয় বিষয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভারতবাসী বিজ্ঞানশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যে, তাঁহাদিগের গবেষণায়, পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। এই প্রসঙ্গে আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা এই সম্পর্কে বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনয়ন

করিয়াছেন। বৃক্ষেরও যে প্রাণ আছে,তাহারাও যে আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে,এ কথা আমরা জানিতাম না—অন্ততঃ স্বীকার করিতাম না। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রত্যক্ষভাবে তাহা প্রমাণ করিয়া বিজ্ঞানজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও রসায়নশাস্ত্রের নূতন ২ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বিজ্ঞানে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে যে প্রাকৃতিক জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়,তাহা ভারতবাসী এখন বুঝিতে পারিয়াছে। গৃহকার্য্য, সামাজিক ব্যাপার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়ামোদ প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিজ্ঞান দিন দিন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। তড়িৎ, শব্দ, আলোক, তাপ, প্রভৃতির মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় ও প্রয়োগে জগতের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। এই সকল কঠিন বিষয়ে ভারতবাসী একপ্রকার অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা এই সকল বিষয়ে জ্ঞানের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের পরেই এই সম্পর্কে এই দেশে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। আজ যে জগতে মানব অবলীলাক্রমে অসাধ্য সাধন করিতেছে, অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সম্পাদন করিয়া লোকের যথেষ্ট সুখসুবিধা করিয়া দিতেছে, বিজ্ঞানই তাহার মূল কারণ। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়, এ কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে বিজ্ঞানই মানুষের প্রাণ। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনা

ব্যতিরেকে কোন লোকের কিংবা কোন জাতির পক্ষে উন্নতিলাভ করা সুদূরপরাহত। সেই স্কুল-কলেজের অধ্যয়ন ব্যতীতও যাহাতে ভারতবাসী বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে পারে, তাহার জন্য অনেক স্থানে বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র ও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহাও এখন এ দেশবাসীর শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বহুদিন ভারতবাসীর অজ্ঞান ও অগ্রহণীয় ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে ঐ সকল বিষয়েও ভারতবাসীর আশাতীত জ্ঞান হইয়াছে। এখন ঐ সকল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠনা হয়; কাজেই ছাত্রগণও ঐ সকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে।

কৃষি ও খনিবিদ্যা।

এই দেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যা ও খনিবিদ্যাও অনেকটা সুসংস্কৃত হইয়া এ দেশবাসীর জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয়ের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া এদেশবাসীর মহোপকার সাধন করিতেছেন।

ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে এই দেশে চিত্রবিদ্যাও ভাস্কর-বিদ্যার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল বটে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান কালের মত

এত সুসংস্কৃত ছিল না। সেই সময় অনেক চিত্র বা আলেখ্যই চিত্রকরগণ লোকের ইচ্ছামত বা অর্থলাভের জন্য চিত্রিত করিতেন। সেই সময় প্রাকৃতিক চিত্র অতিশয় বিরল ছিল। তখন অশিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত চিত্রকরগণ দেবদেবীর ও লোকের অঙ্গভঙ্গীযুক্ত বিকট বিকট চিত্র লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত। আজকাল ইংরাজী শিক্ষার ফলে সে যুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে চিত্রবিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যার দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা অনেকে এই বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ধনোপর্জ্জনের সুবিধা করিয়া লইতেছেন।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর-বিদ্যা।

ফটোগ্রাফ, হাফ্‌টোন ইত্যাদি এ দেশে নূতন আমদানী। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে এ দেশবাসী এই সকল বিষয়েও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছে। এই শিক্ষা এদেশে আরও কত নূতন বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামোফোনের গানের কৃতিত্ব ভারতবাসীর কল্পনাতীত ছিল। শাসক-সম্প্রদায়ের কৃপায় ভারতবাসী সেই সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে শিক্ষালাভ করিতেছে।

ফটোগ্রাফ ও হাফ্‌টোন।

পূর্ব্বে কেবল এই দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই ব্যবসায়-বাণিজ্য আবদ্ধ ছিল। এখন ইংরাজী শিক্ষার ফলে অনেক উচ্চ শ্রেণীর সুশিক্ষিত ভদ্রলোকও ব্যবসায়-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ

ব্যবসা-বাণিজ্য।

করিয়াছেন। ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। ক্রেতাদিগেরও মূল্যাদি নিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানা সংস্থাপনও একান্ত আবশ্যক। অনেক ইংরাজ বণিক্ এ দেশে কল-কারখানা স্থাপন করিয়া এই দেশবাসীর উপকার সাধন করিয়াছেন। আজকাল ইংরাজ ও ভারতবাসীর সহযোগেও অনেকস্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক কল-কারখানায় কাজের সংস্থান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা করিয়াছে।

কল-কারখানা।

ব্রিটিশ-শাসনে কেবল যে বালকদিগেরই নানাবিধ বিদ্যা-শিক্ষার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে; বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষারও নানাপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল বটে, কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় এই বিষয়ে বিশেষ ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আবার এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এইজন্য পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই এখন আমাদের কন্যা ও ভগিনীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি। এই জন্য অনেক প্রদেশে কলেজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার বেথুন

বালিকা-বিদ্যালয়।

কলেজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতিবৎসর এই কলেজ হইতে বহুসংখ্যক বালিকা বি, এ পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এম্, এ পড়িবার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। এম্, এ পড়িতে হইলে উহাদিগকে বালকদিগের সহিত একসঙ্গে ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়িতে হয়। কিন্তু তবুও প্রত্যেক বৎসরই তুই এক জন বালিকা এম্, এ পাশ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহারাও পুরুষেরই মত নানাপ্রকার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। ইংরাজ-শাসনের গুণে ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষা চারিদিকে বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিবে, যেদিন সমস্ত কার্য্যক্ষেত্রেই আমরা পুরুষের পার্শ্বে শিক্ষিত মহিলাদিগকে দেখিতে পাইব। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা শিক্ষায় দীক্ষায়, কার্য্য-কুশলতায় পুরুষের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ উন্নতি।

ইংরাজ-শাসনে কেবল যে শিক্ষা-বিস্তারেই নানাপ্রকার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে; অন্যান্য অনেক বিষয়েও আমাদিগের বহু সুবিধা ও সুযোগ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাহা ছিল না, যাহা আমরা এক প্রকার কাল্পনিক বলিযা মনে করিতাম ইংরাজ-শাসনের কল্যাণে সেই সমস্ত আমরা পাইয়াছি; কেবল পাই নাই—তাহা আমরা অতি অল্পব্যয়ে উপভোগ করিতেছি। এই সম্পর্কে আমা-দিগের প্রথমেই রেল প্রবর্ত্তন ও তাহার বিস্তারের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের লোকের রেলগাড়ীর সম্বন্ধে আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। লর্ড ডালহৌসী যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইস্‌রয় (Viceroy), তখন তাঁহার উদ্যোগে ভারতে সর্ব্বপ্রথম রেল বিস্তার আরম্ভ হয়। তাহার পর হইতেই দেশে সর্ব্বত্র লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রেল ওয়ে লাইনের বিস্তৃতি হইতে আরম্ভ করে। এখন ইহা উর্ণনাভের জালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভারতসাম্রাজ্যে এরূপ সহর ও নগর অতি অল্পই আছে, যেখানে রেল নাই। যাতায়াতের এই সুবিধার জন্য লোকের বিশেষ উপকার

রেলওয়ে।

হইয়াছে। ভারতের অনেক সমতলক্ষেত্রে—এমন কি, পাহাড়-পর্ব্বতময় স্থানেও রেল লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাতে যে কেবল লোকের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। শীঘ্রগামী যানাদির অভাবে পূর্ব্বে দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী করিতে ব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় প্রয়াস পাইতে হইত; কিন্তু রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে। এখন এক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য কেবল সেই দেশেরই একভোগ্য সম্পত্তি নহে। রেলওয়ের বিস্তারে দেশের সর্ব্বত্র তাহার আমদানী ও রপ্তানী হইতেছে। ভারতের কোন্ প্রান্ত সীমানায় কাবুল অবস্থিত; কিন্তু এই রেলের কৃপায় সেই স্থান হইতেও আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি সুস্বাদু ফল আসিয়া ভারতের সমস্ত হাট-বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বোম্বাইয়ের আম ইত্যাদি সুখাদ্য দ্রব্য এখন ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলে এখন ভারত-সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানের যে কোন জিনিষ যে কোন দেশে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অন্য প্রদেশ হইতে রেলের সাহায্যে জিনিষ-পত্রের আমদানী করা হয়; ইহাতে কত লোকের যে জীবন রক্ষিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। রেলওয়ে প্রবর্ত্তনে আমাদের দেশের লোকের যাতায়াতের পক্ষে যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আজ যদি শুনিতে পাই, ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে আমাদের কোন আত্মীয় কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে রেলের কল্যাণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারি।

ষ্টীমার।

রেলের মত ষ্টীমারও আমাদের দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত। রেল ও ষ্টীমার সমসাময়িক। রেলওয়ে ভূমির উপর বিস্তৃত; জলপথে রেলের সাহায্যে যাওয়া যায় না। ষ্টীমার আমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। ভারতের বড় বড় নদীতে এখন ষ্টীমারের যাতায়াত আছে; ইহাতে লোকের গমনাগমনের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অশেষ স্থবিধা ও স্থযোগ হইয়াছে। এখন সকলেই স্বাধীনভাবে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সাহায্যে দেশদেশান্তরে যাতায়াত করিতে পারেন। পূর্ব্বে যখন দেশে রেল কিংবা ষ্টীমার ছিল না, তখন লোককে বিদেশে যাইতে হইলে কত-প্রকার অস্থবিধা ভোগ করিতে হইত! এখন সে সমস্ত অস্থবিধা বহুপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ; ধর্ম্মের জন্য তাহারা সকল প্রকার কষ্ট বরণ করিতে পারে। পূর্ব্বে যখন দেশে রেল ও ষ্টীমার ছিল না, তখন তাহাদিগকে তাহাদিগের তীর্থস্থান দর্শনে অত্যন্ত অস্থবিধা ভোগ করিতে হইত। অবশ্য কোন প্রকার কষ্ট বা অস্থবিধার জন্য ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহারা কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। সেইজন্য তাঁহারা তখনও দলে দলে

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সুদূর তীর্থস্থানগুলিতেও যাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পথ ঘাটের এমনই অসুবিধা ছিল যে, অনেকের পথেই দেহান্তর ঘটিত। আবার কেহ কেহ বা দস্যুহস্তে নিহত হইতেন। এখন রেলের কল্যাণে সকলেই মনের সুখে তীর্থভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষা করিতেছেন।

রেল ও ষ্টীমার লোকের শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছে। পূর্ব্বে যাতায়াতের এই অসুবিধার জন্য পল্লী মফঃস্বল হইতে ছাত্রবৃন্দ শিক্ষার কেন্দ্র সহরে আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারিত না। যাহারা আসিত, তাহাদিগকেও বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। রেল ষ্টীমারের কৃপায় সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। এখন সহর ও রাজধানী ত দূরের কথা, সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত ছাত্রবৃন্দ শিক্ষার জন্য গমন করেন। সেখান হইতে অনেকে নানাবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। রেল ষ্টীমারের অনুগ্রহে এই সুদূর দেশ ভ্রমণেও তাঁহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

রেলওয়ের ন্যায় ষ্টীমারও দুর্ভিক্ষের সময় লোকের প্রাণ রক্ষা করে। যদি ষ্টীমার ও রেল দেশে প্রবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সময় কত লক্ষ লক্ষ লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা বলা দুষ্কর।

শত শত মাইল দূর হইতে যে এক ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ

সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। টেলিগ্রাফ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। ইহা ইংরাজ রাজত্বের বিশিষ্ট দান। এখন লোক ইচ্ছা করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে টেলিগ্রাফের সাহায্যে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে। লর্ড ডাল্‌হৌসির শাসনসময়ে রেল ও ষ্টীমারের মত, টেলিগ্রাফও এই দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ অসুবিধা দূর হইয়াছে। এখন দূরদেশে কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, তাহার আত্মীয়স্বজন টেলিগ্রাফ প্রাপ্তিমাত্র রেল ও ষ্টীমারের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে। টেলিগ্রাফ আজকাল ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টেলিগ্রাফ না থাকিলে ইহা একপ্রকার অচল হইয়া পড়িত। ব্যবসায়িগণ প্রতিদিন টেলিগ্রাফের সাহায্যে দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি জানিতে পারেন; ফলে তাঁহাদিগকে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনে বিশেষ কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। রাজকার্য্যের পরিচালনেও টেলিগ্রাফ শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। প্রজাগণের মধ্যে কোথাও কোন প্রকার অভাব বা অসন্তোষ উপস্থিত হইলে, টেলিগ্রাফের কল্যাণে কর্ত্তৃপক্ষ সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। বিলাতে ও ভারতবর্ষের মধ্যে টেলিগ্রামের

টেলিগ্রাফ।

যোগাযোগ আছে বলিয়াই শাসন-কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

টেলিফোন।

টেলিগ্রাফের মত টেলিফোনও ইংরাজ রাজত্বের অমর কীর্ত্তি। ইহাও টেলিগ্রাফের মত দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের সহায়ক। টেলিগ্রাফের সাহায্যে যেমন দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সংবাদ পাওয়া যায়, টেলিফোনের সাহায্যে তাহা পাওয়া যায় না; কারণ ইহার বিস্তৃতি এখনও ততদূর পর্য্যন্ত হয় নাই—ইহা এখনও সীমাবদ্ধ। সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে টেলিগ্রামের সংবাদ আদান-প্রদান হয়। কিন্তু টেলিফোনে যে যেভাবে বলে তাহার কথা সেই ভাবেই শোনা যায়। রাজধানী ও বড় বড় সহরে টেলিফোনের প্রচলন আছে। ইহাও টেলিগ্রাফের মত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শাসনকার্য্যের বিশেষ সাহায্য করে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কাজ এক প্রকার তারের সাহায্যে ইলেক্‌ট্রিসিটীর সংযোগে নিষ্পন্ন হয়। বিজ্ঞান প্রত্যহই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতৎকে স্তম্ভিত করিতেছে। সম্প্রতি আবার তারহীন টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহাতে বিনা তারেই টেলিগ্রাফ হয়।

রাস্তা ঘাট।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষে যেমন পথ ঘাটের সুবিধা হইয়াছে, পূর্ব্বে এমন আর কখনও হয় নাই। পূর্ব্বে একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাস্তা ছিল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সে যুগ এখন আর নাই; এখন বড় বড়

নগরে সুন্দর বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে: ইহাতে আবার গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। সুতরাং সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রেও লোকের যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না। আজকাল গ্রামে গ্রামে সুপ্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

এরোপ্লেন।

ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে আমাদের গমনাগমন ও যান-বাহনাদির এমন সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে যে, এই সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। তাঁহারা ষ্টীমারের সাহায্যে জলে ও রেলের সাহায্যে স্থলে আমাদের যাতায়াতের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াই নিরস্ত হন নাই; আমাদের আকাশপথে চলিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের দেশে এরোপ্লেন বা ব্যোমযানের আমদানী হইয়াছে। এদেশ হইতে বিলাতে এই ব্যোমযানের সাহায্যে লোকে যাহাতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত ও ডাক প্রেরণ করিতে পারে, সেজন্য নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

রেলের মত ট্রাম ও মোটর গাড়ী লোকের দ্রুত গমনাগমনের সাহায্যে করে। আমরা মোটরের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারি।

ট্রাম ও মোটর।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে মোটর গাড়ী ব্যবহার করা সহজ-সাধ্য নহে; উহা ক্রয় করিতে প্রভূত অর্থ আবশ্যক। বড় লোকরাই

মোটর গাড়ী ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। সুতরাং সাধারণ লোকের মোটর গাড়ীতে সকল সময়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না; কিন্তু ট্রাম গাড়ীতে আপামর জন-সাধারণ সকলেই যাতায়াত করিতে পারেন। পাঁচ পয়সা কি ছয় পয়সা ব্যয় করিলে এই ট্রাম গাড়ীর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর যাইতে পারা যায়। আজকাল আবার ট্রামের মত মোটর বাস্ বড় বড় সহরে বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার সাহায্যেও অল্প ব্যয়ে শীঘ্র অনেক দূর যাতায়াত করা যাইতে পারে।

পোষ্ট অফিস।

এই দেশে পোষ্ট অফিস সংস্থাপন ইংরাজ রাজত্বের বিশেষ কীর্ত্তি। পোষ্ট অফিস দ্বারা ভারতবাসী যে কত উপকার লাভ করিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। টেলিগ্রাফে মনোভাব প্রকাশ করা ব্যয়-সাধ্য। অনেকে সেই ব্যয় বহন করিতে পারে না; সুতরাং চিঠি পত্রের সাহায্যেই অধিকাংশ লোক সংবাদ আদান-প্রদান করে। আজকাল ভারতের প্রায় প্রতি গ্রামেই পোষ্ট অফিস সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে লোকের চিঠি পত্র পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখন নিতান্ত নিঃস্ব দরিদ্র রমণীও একখানি পোষ্টকার্ড ব্যয় করিয়া অতি দূরদেশে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে। ইহাতে তাহার দুইটি পয়সা মাত্র ব্যয় হয়। ব্রিটিশ-শাসনের পূর্ব্বে লোকে কখনও এত অল্প ব্যয়ে দূরদেশে

হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিত না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে লোকে রেজেষ্টারী করিয়াও পত্র লিখিতে পারে; ইহাতে পত্র চুরি হইবার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। পোষ্ট অফিসের সাহায্যে চিঠি পত্র ব্যতীত বুক প্যাকেট ও অন্যান্য দ্রব্যের পার্শেলও প্রেরণ করা যাইতে পারে। রেজেষ্টারী বা ইন্‌সিওর করিয়া টাকা কড়িও ভারতের যে কোন স্থানে পাঠাইতে পারা যায়।

মণি-অর্ডার।

মণি-অর্ডার প্রথা পোষ্ট অফিসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে হুণ্ডীর প্রথা ছিল। কোন মহাজনের নিকট টাকা জমা দিয়া তাঁহার অন্য স্থানের গদী হইতে টাকা গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। ইহাতে অনেক সময় অনেক অসুবিধা ঘটিত। এখন গ্রামে গ্রামে পোষ্ট অফিস স্থাপিত হইয়াছে; মণি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইলে লোকে এখন ঘরে বসিয়া টাকা পাইতে পারে; এই ভাবে টাকা পাঠাইবার ব্যয়ও অতি সামান্য। আবশ্যক হইলে লোকে টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডার যোগেও টাকা পাঠাইতে পারে। ইহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণ করা যায়; এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রবাসীকেও এখন আর টাকার অভাবে কোন প্রকার সাময়িক বিপদে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার বাড়ী হইতে টাকা প্রেরিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে অত্যাশ্চর্য্য বস্তুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত এক স্থানে সমাবিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে লোকশিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। এক-

মিউজিয়াম।

স্থানে বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশ হইলে সেইগুলির পর্য্যালোচনা, গুণাবলীর তুলনা ও পরীক্ষা সহজসাধ্য হয়। তাহাতে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি বর্দ্ধন করিয়া শিক্ষা ও আমোদ প্রদান করিতে কোন প্রকার কার্পণ্য করেন নাই। মিউজিয়াম বা যাদুঘর সৃষ্টি, আলি-পুরের জুলজিকেল গার্ডেন বা পশুশালা স্থাপন, শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল স্থানে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ইহা দ্বারা আমাদের কত প্রকার শিক্ষা হয়। যাদুঘরে দেব ও মানবের সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সমাবেশ করা হইয়াছে।

ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ পৃথিবীর নানাদেশে কত

পশুশালা।

প্রকারের জীব জন্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না; তাই গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের দর্শন ও শিক্ষার জন্য পশুশালা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে নানা প্রকারের পক্ষী, ভীষণ শ্বাপদ জন্তু, সুন্দর জলচর ও স্থলচর প্রাণীর একত্রে সমাবেশ করা হইয়াছে।

ইহা দেখিলে ঈশ্বরের অপার সৃষ্টিকৌশল বুঝিতে পারা যায়। তখন মন বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়।

আমাদের দেশে নানা বন উপবন আছে। শিবপুরের উদ্যানে সেই সমস্ত বন উপবনের—বিবিধ বৃক্ষগুল্মের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। এই স্থানে গমন করিলে বুঝিতে পারা যায় উদ্ভিদ্ কত রকম হইতে পারে।

বোটানিকাল গার্ডেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। হস্তে লিখিয়া লোকের পুস্তক রচনা করিতে হইত। সুতরাং তখন শিক্ষাবিস্তার সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজ পাদ্‌রীগণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই দেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে এদেশে বিভিন্ন প্রকার পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে ফলে অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের আর একটা দান সংবাদপত্র।

মুদ্রাযন্ত্র।

এই দেশের প্রথম সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ"। শ্রীরামপুরের পাদ্‌রীগণ ইহা সম্পাদন করিতেন। ইহাতে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কীয় নানাবিধ প্রবন্ধ থাকিত। তার পর দেশে যতই মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই সংবাদপত্র ও পুস্তকের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। আজকাল এমন জিলা বা এমন মহকুমা নাই, যেখানে কোন মুদ্রাযন্ত্র বা কোন সংবাদপত্র নাই। সংবাদপত্র দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করে।

সংবাদ পত্র।

স্মৃতিরক্ষা।

ব্রিটিশ-শাসনে প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানাস্থানে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন পুরাতন দুর্গ ও কীর্ত্তিস্তম্ভের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছে, পুরাতন রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও সংস্কৃত হইতেছে, পুরাতন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দির ও সমাধিক্ষেত্র সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, দেশ-গৌরব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের স্মৃতি চির-জাগরূক রাখিবার জন্য আমরা ভূতপূর্ব্ব বড়লাট পরলোকগত লর্ড কার্জ্জনের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনিই এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কল-কারখানা।

ধনবৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোথাও কার্পাসের কল ছিল না। ইংরাজশাসনের গুণে সম্প্রতি নানাস্থানে, বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলে অনেকগুলি কার্পাসের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসকল কলের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। এই কলজাত দ্রব্য হইতে ভারতে যথেষ্ট ধনাগম হইতেছে। ইহা যে কেবল ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে, পরন্তু জাপান, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশে ইহার যথেষ্ট সমাদর আছে। বঙ্গদেশে অন্যান্য কল অপেক্ষা পাটের কলের সংখ্যা অত্যধিক। বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রত্যহই পাট ও পাট নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বহু-পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। উত্তর ভারতে পশমী

বস্ত্র বয়ন করিবার অনেকগুলি কল আছে। যত দিন যাইতেছে, এই কলগুলি ততই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। এ দেশের কাগজের কলের অবস্থাও মন্দ নহে। ব্রহ্মদেশের চাউলের কলও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। বঙ্গদেশে ক্রমেই এই সমস্ত কল-কারখানার সংখ্যা বাড়িতেছে। কল-কারখানার বিস্তৃতির জন্য অনেক সময়ে বিদেশী বণিকের বাণিজ্যের প্রসার আশানুরূপ হয় না। গত ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে এ দেশে চা ব্যতীত অন্যান্য জিনিষের ৮৯১টি মাত্র কারখানা ছিল। আটবৎসরের মধ্যে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৭১৮টীতে পরিণত হইয়াছিল। এখন ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। এই কলগুলিকে সাধারণতঃ পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে অস্থিচূর্ণকারী কল, সিমেণ্ট্ উৎপাদনকারী কল, গালার কল, তৈলের কল, চিনির কল, চাউল ও ময়দার কল, রেশমের কল প্রভৃতি ধর্ত্তব্য। ইংরাজশাসনে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে মিঃ (এখন স্যার) জে,জি, কামিং এক সুবিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে আমরা এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। এই প্রসঙ্গে তিনি ইচ্ছাপুরের অস্ত্রের কারখানা, দমদমার বারুদ, কাশীপুরের গোলা, কাঁচড়াপাড়া, বেলেঘাটা, শিয়াল-দহ ও চিৎপুরের লৌহবর্ত্ম যন্ত্রাদি, খিদিরপুরের ষ্টীমার, আলীপুরের বস্ত্র, ভবানীপুরের টেলিগ্রাফের আবশ্যক যন্ত্রাদি, পাটনার অহিফেন, ও অহিফেনের জন্য বাক্স, মেদিনীপুর.

কটক ও কলিকাতার খালনির্ম্মাণের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ-বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারের সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে কল-কারখানার সাহায্যে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে। যে সকল কারখানায় অন্যূন পঞ্চাশ জনের অনধিক মজুর নিযুক্ত আছে, সেইগুলিকে বাদ দিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তাহাতে জানা যায় বাঙ্গালাদেশে নিম্নলিখিত নানাশ্রেণীর বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ ভালভাবে চলিতেছে।

(১) কাপড়ের কল, সূতার কল, পাটের ও চটের কল, কাগজের কল, দড়ির কারখানা, রেশমকুঠী।

(২) কয়লার খনি, লোহার খনি, অভ্রের খনি, অভ্র পরিষ্কার করিবার কারখানা, সোডার কারখানা, পিতল কাঁসার কারখানা।

(৩) নৌকা, ষ্টীমার, রেলওয়ের কারখানা, ট্রামের কারখানা।

(৪) হাড়ের গুঁড়া, সিমেণ্ট্, ঔষধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, মদ, দুগ্ধ ও ক্ষীরের দ্রব্য, ময়দা, বরফ, সোডা, লেমনেড্, চিনি, গ্যাস, নীল, কেরোসিনের বাক্স, গালা, তৈল, মাটীর জিনিষ।

(৫) সাবান, চামড়া, ইষ্টকাদিসম্পর্কীয় নানাবিধ জিনিষের কারখানা।

পতিত জমি উদ্ধার।

ভারতবর্ষে অনেক পতিত জমি আছে। পতিত জমি কৃষিযোগ্য করিবার জন্য ব্রিটিশ-শাসনের প্রারম্ভ হইতেই নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট্ এই বিষয়ে প্রজাগণকে নানারূপ উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।

জমি জরিপ।

দেশের কোথায় কি পরিমাণ জমি আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এদেশে জরিপ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে দেশের রাজস্ব ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রভৃতি জানা যায়। ভূমি জরিপ ব্যতীত সামুদ্রিক জরিপ, ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় জরিপ ইংরাজশাসনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পানীয় জলের ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ-শাসনে লোকের কোন দিক্ দিয়া কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, সেই জন্য শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই সতর্ক। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানে জলাশয়ের বিশেষ অভাব ছিল, এখন কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় তাহা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল পল্লীগ্রামে লোক কূপ ও পুষ্করিণীর দূষিত জল পান করিয়া নানাপ্রকার ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া পড়িত, এখন তাহাদের অনেক স্থানে সরকারের পরামর্শে নির্ম্মল পানীয় জলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অনেক স্থানে কূপ খনন করা হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটী তাহাদের এলাকার মধ্যে অনেক সময় এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কোন কোন জায়গায়

তাঁহারা নিজেরাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই প্রকারে লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্য করিয়াছেন।

প্রচীনকালে ভারতবর্ষে হাসপাতাল ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। তবে, বৌদ্ধরাজ অশোকের সময়ে এ দেশে যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানেরা যখন এ দেশের রাজা, তখন তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কিছু করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু ইংরাজশাসনে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। আজকাল প্রায় প্রতি জিলা ও মহকুমায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল হাসপাতালে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের তত্ত্বাবধানে রোগীদিগের চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই যৎসামান্য ব্যয়ে, অবস্থাভেদে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারে। জীবে দয়া যদি প্রধান ধর্ম্ম হয়, তবে ইংরাজরাজ যে সে ধর্ম্ম বিশেষভাবে পালন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের চেষ্টায় ও উদ্যোগে প্রত্যেক হাসপাতালের জন্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও রোগীদিগের জন্য সুপরিষ্কৃত বিছানা, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার, পরিচারিকা ও চাকর নিযুক্ত রহিয়াছে। রোগীর চিকিৎসার জন্য এমন সুন্দর বন্দোবস্ত পূর্ব্বে বোধ হয় কোন রাজার রাজত্বের সময় ভারতবর্ষে হয় নাই।

হাসপাতাল।

হাসপাতাল ব্যতীত সাধারণ নিঃস্ব দরিদ্র লোকের চিকিৎসার জন্য পল্লী মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানেও বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র লোকদিগের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের পক্ষে ধারণা করাও অসম্ভব।

দাতব্য চিকিৎসালয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট্ এই দেশে তাহার সংস্কার করিয়া লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। বড় বড় সহরে অতি সুন্দর পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে। সুদূর পল্লী-গ্রামেও এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইতেছে। পয়ঃপ্রণালী না থাকিলে আবদ্ধ জল দূষিত হইয়া উঠে। ইহাতে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করায় ঐ সকল ব্যাধির আক্রমণ অনেকটা কমিতেছে।

পয়ঃপ্রণালী।

আমাদিগকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জলপথে বা স্থলপথে যেখানেই এই প্রকার আক্রমণের আশঙ্কা আছে, সেইখানেই সরকার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগকে সুরক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের বন্দরে জাহাজের জন্য পোতাশ্রয় তৈরী হইয়াছে। কলিকাতা ও

দুর্গ নির্ম্মাণ।

বোম্বাই ব্যতীত মান্দ্রাজ, করাচি, ডায়মণ্ড্ হার্বার্ ও চট্টগ্রামে বন্দর আছে। সকল বন্দরেই জাহাজের আশ্রয় ও জাহাজ হইতে নামিবার ব্যবস্থা আছে। গঙ্গা, যমুনা, শোণ, হুগলী, পদ্মা প্রভৃতি বৃহৎ নদ নদীর উপরে সুন্দর সুন্দর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

বন রক্ষার ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বন আছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল বন রক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না; অথচ ইহার দ্বারা আমাদের যথেষ্ট ধনাগম হয়। ইহার কাঠ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া আমরা অনেক টাকা পাইতে পারি। ইংরাজ সরকার এই বনরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

এই দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগমুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্ট্ নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ঔষধাগার ও বাতুলালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই জন্মমৃত্যু তালিকা, সাধারণ স্বাস্থ্য, টীকা, চিকিৎসা, আইন, রোগবীজ পরীক্ষা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে বিদেশ হইতে কোন সংক্রামক ব্যাধি দেশে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সতর্ক আছেন। কোন স্থানেই বৈদেশিক জাহাজ হইতে

যাত্রী ও নাবিককে পরীক্ষা না করিয়া নামিতে দেওয়া হয় না। সরকারের সাহায্যে ও আনুকুল্যে ক্রমেই এই দেশীয় লোক এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছে। সরকারও এই জন্য নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা করিতেছেন। সম্প্রতি স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য স্ত্রী-চিকিৎসক ও শিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় ধাত্রীদিগের শিক্ষার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ে নানাপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পশু চিকিৎসালয়।

এই দেশে মানুষের মত পশুদিগেরও রোগের চিকিৎসার জন্য নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু পশুচিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা এই সকল পশুচিকিৎসালয় হইতে বহুদূরে বাস করে, তাহাদিগের গৃহপালিত পশুর চিকিৎসারও সরকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় পশু-চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া পশুগুলির চিকিৎসা করেন।

কুষ্ঠ রোগীর আশ্রম।

গবর্ণমেণ্টের সৌজন্যে ও অনুগ্রহে দেশে কুষ্ঠ-রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য কতিপয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুষ্ঠ-রোগীরা এইখানে অবস্থান করিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে এই প্রকার আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেইজন্য বর্ত্তমান গবর্ণর-জেনারেল লর্ড রেডিং চেষ্টা করিতেছেন। এই

উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি জনসাধারণের নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছেন।

মহামারীর প্রতিকার।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য মহামারীর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। কলেরা, বসন্ত, সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি ব্যাধি দেশে আরম্ভ হইলেই রোগীর শুশ্রূষা, রোগের গতি নিবারণ এবং সেই মহামারীর কারণ ও ইতিহাস নির্ণয় করিবার জন্য অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। প্লেগ, বেরিবেরি ও কালাজ্বর নিবারণের জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। বসন্ত ও প্লেগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এদেশে টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল পীড়ায় টীকা যে বিশেষ প্রতিষেধক, তাহা ক্রমেই প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বে লোকের যে বসন্ত হইত সেই বসন্তের বীজ দিয়া টীকা দিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই প্রকার টীকা অতিশয় মারাত্মক। সেইজন্য ব্রিটিশ-শাসনে গো-বীজের সাহায্যে টীকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

টীকা।

সপ্তম অধ্যায়।

ভারতের কৃষিজাত ও খনিজদ্রব্যসমূহ।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই দেশে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু রাজার দৃষ্টি না থাকিলে কোন কার্য্যেরই উন্নতি হয় না। প্রাচীন রাজগণ এই দিকে বিশেষ অবহিত না হওয়ায় কৃষিকার্য্যের সমধিক উন্নতি হয় নাই। হিন্দু রাজগণের শাসনসময়ে কৃষিকার্য্য যে প্রণালীক্রমে সম্পাদিত হইত, মুসলমান রাজত্বকালেও সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহে কৃষকের কৃষিকার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইত। অনেকেই কৃষকদিগকে হীন বলিয়া উপেক্ষা করিত। ফলে, শিক্ষিত লোকগণ কেহই এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষিকার্য্যের সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই দিকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা ও উদ্যোগে কৃষিকার্য্যের উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষকগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া সুচারুরূপে এইকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এমন কি, অনেক শিক্ষিত লোকও

এখন এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে কোন প্রকার লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন না। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কৃষির জন্যও স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে কৃষির উন্নতি হয় ও কৃষিজীবীর অবস্থা স্বচ্ছল হয় সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট্ প্রথমাবধিই চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে যে প্রকার উন্নততর প্রণালীক্রমে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার প্রণালী এদেশেও প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অনেক স্থানে কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট্ কৃষিব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। কৃষির উপযোগিতা পরীক্ষার জন্য নূতন নূতন স্থান পরীক্ষিত হইতেছে ও নানা শস্যের বীজ বপন করিয়া তাহাদের উর্ব্বরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। যে সকল পাহাড় পর্ব্বত এতদিন নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, ইংরাজদিগের চেষ্টায় সেই সকল স্থান এক্ষণে চা বাগানে পরিণত হইয়াছে।

এই সকল চা-বাগানে অনেক দরিদ্র ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের উপায় হইয়াছে। ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চাউল, মুগ, কলাই, ছোলা, মটর, প্রভৃতি ডাইল, যব, গম, ভুট্টা, সরিষা, মসিনা, তিল, ইক্ষু, খর্জ্জূর, তূলা, পাট, নীল, তামাক, আফিঙ, তুঁতে, চা, কাফি, সিঙ্কোনা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা চাউল এদেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এদেশে চাউলই অধিকাংশ লোকের জীবনধারণের প্রধান সম্বল।

নিম্ন ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশের বৃহৎ বৃহৎ নদীগুলিও গোদাবরী, কৃষ্ণা, ও কাবেরীর "ব"দ্বীপ গুলি (Delta) সমুদ্রকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড এবং ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার, কানাড়া, কঙ্কণ প্রভৃতি দেশের নিম্ন স্তরের ভূভাগ সর্ব্বপ্রকার ধান্য চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট ভাগে ধান্যের চাষ যে অত্যন্ত বিরল তাহা নয়; কিন্তু, সে সকল প্রদেশে ধান্য অপেক্ষা অন্যান্য দ্রব্যের চাষই অধিক হয়। আসাম ব্যতীত অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রদেশে চীনা (Millets) ধান্যের চাষ অত্যন্ত অধিক হয়। কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—সমগ্র ভারতের কথা ধরিলে চীনা ধান্যই দেশের মুখ্য খাদ্য শস্য।

ধান্য।

পাট বাঙ্গালাদেশের সম্পত্তি। সমগ্র বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে, ইহার চাষ অধিকতররূপে হইয়া থাকে। হুগলি, ব্রহ্মপুত্র, ও মেঘনা নদীর "ব"দ্বীপ সমূহে যে সমস্ত পাট জন্মে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। আজ কাল পাটের চাষের যে প্রকার উন্নতি ও ইহার ব্যবসায় যে প্রকার প্রসার লাভ করিয়াছে, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে তাহা ছিল না। ইংরাজ বণিক্‌দিগের শস্য ব্যবসায়, বিশেষতঃ গমের ব্যবসায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে থলিয়ার (গনি ব্যাগ) বিশেষ প্রয়োজন। পাট না হইলে থলিয়া প্রস্তুত হয় না।

পাট।

সুতরাং, পাটের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত পাট হইতে এক প্রকার সূতা প্রস্তুত হয়; সেই সূতাও আমাদের অনেক প্রকার প্রয়োজনে লাগে। পাটের ব্যবসায়ে অধিক লাভ হওয়াতে অনেক কৃষক এখন ধান্য-ক্ষেত্রে পাট রোপণ করিতেছে। ফলে, উৎপাদিত ধান্য-শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

রেশমের চাষ।

ভারতবর্ষে রেশমের ব্যবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" যখন এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করে, তখন এই ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছিল। তাহাদিগের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ইহা আবার পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। বঙ্গদেশেই গুটীপোকার চাষ অধিক পরিমাণে হইত বলিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" এই দেশে অনেকগুলি রেশমের কুঠী স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা এই সকল কুঠীতে রেশম বাহির করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিল। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে কৃষকেরা গুটীপোকা আনিয়া এখানে বিক্রয় করিত।এই কোম্পানীর চেষ্টায় ও উদ্যোগে গুটী হইতে সূতা বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য এই দেশে ইটালি হইতে একদল সুদক্ষ শ্রমজীবীকে আনা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের রেশম ব্যবসায় অন্যান্য দেশের রেশম ব্যবসায়কে পরাভূত করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন এখন আর নাই। আজ কাল জাপান ও চীনের রেশম ও ভূমধ্যসাগরের

উপকূলস্থ দেশজাত রেশম সকল বাজারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

চা ও কাফি।

চা, কাফি ও সিঙ্কোনার চাষের সহিত এদেশের সাধারণ কৃষকের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। ইহাদের চাষ ও ব্যবসায় প্রধানতঃ ইউরোপের অর্থে ও ইউরোপীয় শিল্পীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট্ই কাফি ব্যতীত চা ও সিঙ্কোনার চাষ এই দেশে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

আমদানী ও রপ্তানী।

ভারতবর্ষের বহু শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়; আবার সেই সব দেশ হইতেও এই দেশে বহুবিধ জিনিষের আমদানী হয়। পূর্ব্ব হইতেই ভারতের আমদানী ও রপ্তানীর উপর শুল্ক রহিয়াছে। তখন রপ্তানী শুল্ক অপেক্ষা আমদানী শুল্ক অধিক ছিল। সময় সময় আবার রপ্তানী দ্রব্যকে শুল্ক হইতে মুক্তি দান করা হইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই শুল্ক সম্পর্কে এক নূতন নিয়ম হয়। তখন কেবল চাউল, নীল এবং লাক্ষার রপ্তানীর উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ইংলণ্ডের তূলা প্রভৃতি আমদানী দ্রব্যের উপরেও শুল্ক বসান হয়। অতঃপর কয়েক বৎসর পরে এই শুল্ক তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লবণ ও সুরা ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্রব্যেরই আমদানী শুল্ক রহিত করা হয়। কিছুদিন পরে আবার অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ও আমেরিকার কেরোসিনের

উপর আমাদানী শুল্ক স্থাপিত হয়। এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যে সমস্ত চা, কাফি ও চাউল রপ্তানী হয়, তাহার উপরেও শুল্ক আদায় করিবার নিয়ম আছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কার্পাস-জাত সূত্রকে শুল্কবিমুক্ত করা হয়। কিন্তু, বিদেশ হইতে যে সমস্ত কার্পাসজাত দ্রব্য আমদানী হইত তাহাদিগের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা এবং ভারতবর্ষের কলে যে সমস্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহার উপরেও ঐহারে শুল্ক আদায়ের নিয়ম হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাধারণভাবে এই শুল্ক বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা পাঁচ টাকা হইতে সাড়ে সাত টাকা পর্য্যন্ত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেই শুল্ক শতকরা সাড়ে সাত টাকা হইতে এগার টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অনটনের জন্য সম্প্রতি মোটর গাড়ী, সাইকেল, রেশমী বস্ত্রাদি, চিনি, কেরোসিন, তামাক প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের উপর নূতন করিয়া আমদানী শুল্ক ও চাউল, পাট ও চায়ের উপর রপ্তানী শুল্ক বসান হইয়াছে। ফলতঃ এই দেশের প্রজাবৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ চিরদিন আমদানী ও রপ্তানী জিনিষের উপর শুল্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

শাসন-বিভাগ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ভারতশাসনের জন্য যাঁহাকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে ভারত-সচিব বলে। ভারত-সচিবের নিয়োগে সম্রাটের সম্মতি আবশ্যক। ভারত-সচিব ভারতশাসনের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ভারতসম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়েরই দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে পার্লামেণ্টের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয়। তিনি বিলাতে বসিয়া কয়েক-জন সদস্যের সাহায্যে ভারতসম্পর্কীয় সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। এই কয়েকজন সদস্যকে ভারত-সচিবের দপ্তরের সদস্য বলে। এই দপ্তরে আটজনের অনধিক বারজনের অধিক সদস্য হইতে পারে না। যাঁহারা অন্ততঃ দশ বৎসর ভারতে চাকরী করিয়াছেন, অর্দ্ধেক সদস্যকে সেই প্রকার লোক হইতে হইবে। ভারতসম্বন্ধে যাঁহাদিগের কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা ভারত-সচিবের দপ্তরের সদস্য হইতে পারেন না। এক এক জন সদস্যকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হয়। আবশ্যক হইলে তাঁহার নিয়োগের নির্দ্দিষ্ট কাল আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যভার ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর

ভারত সচিব ও তাঁহার দপ্তর।
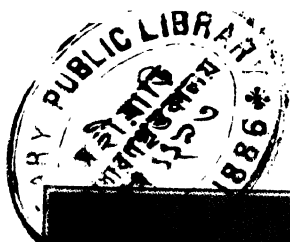
লর্ড আরউইন

অর্পিত থাকে। গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই দপ্তরে একটি নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম "ভারতের হাই কমিশনার" (High Commissioner for India)। তাঁহাকে ভারত-সচিবের দপ্তরের ভাণ্ডার ও হিসাবপত্র বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। বর্ত্তমানে এই পদে একজন বাঙ্গালী আছেন; তাঁহার নাম সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ ভারতে বসিয়া যিনি ভারতশাসন কার্য্য পরিচালিত করেন, তাঁহাকে গবর্ণর-জেনারেল বা বড়-লাট বলে। বর্ত্তমানে লর্ড রেডিং এই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার পরেই মাননীয় মিঃ ই, এফ, এল, উড্ (The Rt. Hon'ble Mr. E. F. L. Wood, Baron Irwin of Kirby Under-Dale in the County of York) ভারতের বড়লাট হইবেন। পার্লামেন্টের আদেশানুসারে ভারত-সচিব ভারতশাসন সম্পর্কে যাহা নির্দ্দিষ্ট করেন বড়লাটকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। এক এক জন বড়লাট পাঁচ বৎসরের জন্য শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া ভারতে আসেন। ভারতসচিবের মত বড়লাটেরও এক কার্য্য-কারী সভা (Executive Council) আছে। এই সভার সদস্য দিগের সাহায্যে তাঁহাকে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে হয়। বর্ত্তমানে জঙ্গীলাট ব্যতীত বড়লাটের কার্য্যকারী সভায় সাত-জন সদস্য আছেন। এই সকল সদস্যের মধ্যে অধিকাংশের

বড়লাট।

মতে যাহা করণীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, অনেক স্থলে বড়লাটকে তাহাতেই সম্মতি দান করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবশ্যক বোধে তিনি তাঁহার কার্য্যকারী সভার সদস্য বৃন্দের মত উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারেও কার্য্য করিতে পারেন। আইনে এই প্রকার বিধান আছে। গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতশাসন সম্পর্কে অনেক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; তদনুসারে নিয়ম হইয়াছে যে, ভারতশাসনসম্পর্কে বড়লাটকে ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ" (Legislative Assembly) ও "রাষ্ট্রিয় পরিষদ্" (Council of State) নামে দুইটী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্রিয় পরিষদের সদস্যের সংখ্যা ষাট জন। উহাদিগের মধ্যে তেত্রিশ জন সদস্যকে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। "রাষ্ট্রিয় পরিষদে" বাঙ্গালার ছয়জন নির্ব্বাচিত সদস্য আছেন। "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের" সদস্য সংখ্যা ১৪৪ জন। উহাদিগের মধ্যে ১০৩ জন বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন। অবশিষ্টাংশ সরকারের মনোনীত সদস্য। "রাষ্ট্রিয় পরিষদের" কার্য্য পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চলে, তারপরে আবার নূতন নির্ব্বাচন হয়। "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্" তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়। তিন বৎসর পরে আবার নূতন করিয়া সদস্যবৃন্দকে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত করিতে হয়। "রাষ্ট্রিয় পরিষদ্" কিংবা "ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ্"—

ভারতীয় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিয় পারিষদ।

কোন পরিষদেই বড়লাট স্বয়ং প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিতে পারেন না। প্রত্যেক পরিষদেরই পৃথক্ পৃথক্ প্রেসিডেন্ট্ থাকেন। বড়লাট "রাষ্ট্রিয় পরিষদের" সদস্যদিগের মধ্য হইতে একজনকে ইহার পদে নিযুক্ত করেন। "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের" যিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট্ হইয়াছেন, তাঁহাকে চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে, সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে আর একজনকে এই পদে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

প্রেসিডেন্ট।

ব্রিটিশশাসিত ভারতের সকল অধিবাসী, সকল স্থান ও সমস্ত বিষয় সম্পর্কে "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্" আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। উভয় পরিষৎকর্ত্তৃক কোন আইনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত না হইলে তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে না; উভয় পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও বড়লাটের সম্মতি ব্যতীত তাহা কার্য্য-করী হইতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা রহিত করিয়া দিতে পারেন।

অধিকার।

সমস্ত ব্রিটিশ ভারতকে কতকগুলি অংশ বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রদেশের বিস্তৃতি ও দায়িত্ব অনুসারে গবর্ণর বা চিফ্‌কমিশনারের উপর ইহার শাসনের ভার অর্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ লেপ্টেনাণ্ট্ গভর্ণরের শাসনাধীন ছিল। এখন ইহার প্রধান শাসনকর্ত্তাকে গবর্ণর বলে। আজকাল লর্ডলিটন বাঙ্গালার গভর্ণর। প্রত্যেক প্রদেশে সেই

প্রদেশ সম্পর্কীয় আইন-কানুন প্রস্তুত করিবার জন্য এক একটী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা আছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রথম প্রেসিডেন্ট্‌কে সরকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখন এই পদে সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে একজন নির্ব্বাচিত হইতেছেন। বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার যিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট্‌ হইয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী, তাঁহার নাম সামশুল হুদা। তিনি মারা গিয়াছেন। গবর্ণরদিগকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে হয়। গত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব পরলোকগত মিঃ ই, এম্‌, মণ্টেগুর চেষ্টায় ও যত্নে ভারত-শাসন-সম্পর্কীয় আইনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই আইন অনুসারে গবর্ণরকে দেশ-শাসন সম্পর্কে তাঁহার কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ ব্যতীত মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে গবর্ণরকে সেই প্রদেশের মন্ত্রিনিয়োগ করিতে হইবে। কোন মন্ত্রীর উপর ব্যবস্থাপক সভার বিশ্বাস ও আস্থা না থাকিলে, তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, কৃষি বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগের ব্যবস্থাদির ভার মন্ত্রীদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে। সেই সকল বিভাগের উন্নতিকল্পে যখন যাহা করা কর্ত্তব্য, মন্ত্রিরা তখন তাহা করিতে পারেন।

মন্ত্রী।

ব্রিটিশ শাসনের মূল উদ্দেশ্য, ভারতবাসীকে শাসনকার্য্যে দক্ষ করিয়া তোলা। তাহারা যাহাতে নিজেরাই একদিন দেশ শাসন করিতে পারে, তাহাদিগকে সেই প্রকার শিক্ষা দেওয়াই ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতশাসন সম্পর্কে যে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। আমাদের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় একত্র হইয়া আমাদের জন্য আইন-কানুন প্রণয়ন করিবেন। আমাদের মন্ত্রীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা কল্যাণজনক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন। অবশ্য, এখন পর্য্যন্ত আমরা এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত হই নাই। এই অধিকার লাভ করা না করা আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। যতটুকু অধিকার আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, ততটুকু অধিকার অনুসারে আমরা যদি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। শাসনকার্য্যে আশানুরূপ দক্ষতা দেখাইতে পারিলে ক্যানাডা প্রভৃতি রাজ্যের মত আমাদিগকেও সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইবে।

স্বায়ত্ত শাসন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজার প্রতিনিধিরূপে যিনি ভারত

শাসনের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহাকে বড়লাট বলে। বড়লাটের বার্ষিক বেতন আড়াই লক্ষ টাকা। এক এক প্রদেশে যিনি শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে গবর্ণর বা চিফ্ কমিশনার কহে। উঁহাদিগের বেতনে অবস্থাভেদে নানারকম তারতম্য হয়। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণরেরা অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের অপেক্ষা অধিক বেতন পান। উঁহাদের প্রত্যেকের বেতন বার্ষিক এক লক্ষ আটাশ হাজার টাকা। পাঞ্জাব এবং বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণরদিগের প্রত্যেকের বেতন বার্ষিক এক লক্ষ টাকা। মধ্য প্রদেশের গবর্ণরের বেতন বার্ষিক বাহাত্তর হাজার ও আসামের গবর্ণরের বার্ষিক বেতন ছয়ষট্টি হাজার টাকা। শাসনকার্য্যসম্পর্কেও বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইএর গবর্ণরেরা অন্যান্য গবর্ণরদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা উপভোগ করেন। এই তিন জন গবর্ণর কোন কোন বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে ভারতসচিবের সহিত লেখালেখি করিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের এই সুবিধাটুকু নাই। প্রত্যেক গবর্ণরকে কার্য্যকারী সমিতির সদস্যবৃন্দ ও মন্ত্রীদিগের সাহায্যে শাসন কার্য্য পরিচালিত করিতে হয়। কোন কার্য্যকরী সমিতির সদস্যের সংখ্যা চারি জনের অধিক হইতে পারিবে না। এক এক জনকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণরেরা যে পাঁচ বৎসরের জন্য শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, সেই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা

কোন কারণে ছুটী লইয়া দেশে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু কিছুদিন হইল এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণরেরা আবশ্যক হইলে বিদায় লইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিকালে তাঁহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যকারী সমিতির যে সদস্য সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়ার অর্থাৎ বহুদিনের পুরাতন তিনি তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ করিবেন, ইহাই বহুদিনের প্রচলিত রীতি।

ব্রিটিশশাসিত ভারতসাম্রাজ্য বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্থান, আজমীর মাড়োয়ার, কুর্গ, আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত। ইহার এক একটী প্রদেশে অনেকগুলি জিলা লইয়া এক একটী বিভাগ বা ডিভিসন আছে; ডিভিসনের কর্ত্তা কমিশনার। তিনি জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যাবলী অনুসন্ধান করিতে পারেন। রাজস্ব বা রেভিনিউ সম্পর্কীয় মোকর্দ্দমায় কলেক্টরের বিচারের উপর আপীল করিতে হইলে তাঁহার নিকট করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার অধীন জিলাগুলির শাসন ও অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন।

ডিভিসনাল বা বিভাগীয় কমিশনার।

প্রত্যেক জিলায় এক একজন জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্

জজ ম্যাজিষ্ট্রেট।

আছেন। জজ জিলার বিচার-বিভাগের প্রধান বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট জিলার কর্ত্তা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বা কর আদায়ের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত। ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারী বিভাগের আপীল জিলার জজের এজলাসে হইতে পারে। প্রয়োজনানুসারে তিনি তাহা রদ বা সমর্থন করিতে পারেন। তিনি অপরাধীর শাস্তির হ্রাস বা শাস্তির পূর্ব্ব হুকুম বাহাল রাখিতে পারেন। প্রত্যেক জিলার শাসনকার্য্যের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটে দায়ী। তাঁহার শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জিলায় দুই বা ততোধিক মহকুমা আছে। সেখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রধান কর্ত্তা। শাসনবিষয়ে তাঁহাদিগকে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়। কার্য্যের আধিক্য অনুসারে প্রত্যেক মহকুমা আবার অবস্থানুসারে চারি পাঁচটী থানায় বিভক্ত। থানাকে "পুলিস ষ্টেশন" বলে। সেখানে একজন বা অবস্থাভেদে দুই তিনজন সাব্-ইন্স্পেক্টর থাকেন। তাঁহাদের অধীনে কতকগুলি কনষ্টেবল থাকে। কোথাও খুন, চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, গৃহদাহ, মারপিট প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস সেই সকল বিষয় তদন্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদিগের জিলার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করে। থানার অধীন গ্রামসমূহের তত্ত্বাব-

মহকুমা।

থানা।

ধানের ভার সাব্-ইন্স্পেক্টরগণের উপর অর্পিত হইলেও শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি গ্রামে কয়েকজন করিয়া চৌকিদার থাকে; তাহারাই গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষা করে। এই চৌকিদারগণের উপর আবার পঞ্চায়েত থাকেন। সাধারণতঃ গ্রামের লোক হইতেই পঞ্চায়েতগণ নিযুক্ত হয়েন। এই পঞ্চায়েত-মণ্ডলীর উপর আবার একজন প্রধান পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিবার প্রথা আছে। তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েত বলা হয়। তিনি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। তাঁহাকে সর্ব্বদা ম্যাজিষ্ট্রেট ও থানার সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়। গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে সরকার ক্রমেই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতেছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার জন্য সরকারের চেষ্টায় কোন কোন গ্রামে ইউনিয়ান বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডের সদস্যেরা গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হয়েন। তাঁহারা গ্রামের সাধারণ মামলা মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া দেন। সাধারণ বিষয়ের জন্য অনেক গ্রামের গ্রামবাসীদিগকে এখন আর জিলা বা মহকুমার আদালতে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না। ইউনিয়ান বোর্ডেই তাহাদিগের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হন।

জল-পুলিস।

স্থলপথে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিয়াই যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট্ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন তাহা নহে, আমরা যাহাতে জলপথেও চোর ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত না হই, তাঁহারা সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্নস্থানে জল-পুলিশের বন্দোবস্ত হইয়াছে। বড় বড় নদীতে জল-পুলিশের নৌকা (পেট্রল বোট) প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাতে চোর ডাকাতেরা নৌকারোহী-দিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পায় না।

সৈন্য।

ভারত-সরকার বিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জল ও স্থল-পুলিশ নিযুক্ত করিয়াই আপনাদিগের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত করিয়া সেখানে প্রয়োজনানুরূপ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রায় আশী হাজার ইংরাজ সৈন্য ও সাড়ে তিন লক্ষ দেশীয় সৈন্য আছে। দেশীয় সৈন্যগণের মধ্যে শিখ, গুর্খা, রাজপুত ও মারাঠিদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনই সাহসী। তাহারা ইংরাজী রীতিনীতি অনুসারে কুচ্‌কাওয়াজ্‌ শিক্ষা করিয়া রাজ্য-রক্ষার প্রধান সহায় হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি।

এই সকল সৈন্যদলের প্রধান কর্ত্তাকে "কম্যাণ্ডার-ইন্‌-চিফ্‌" বা প্রধান সেনাপতি বলে। ভারতের সমস্ত সৈন্য তাঁহার অধীন। কোন কোন স্থানে সৈন্যপরিরক্ষিত দুর্গাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় অনেকটা কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দুর্গমধ্যে গোলাগুলী, বন্দুক, কামান প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী। অস্ত্রশস্ত্রাদি সর্ব্বদাই

মজুত থাকে। আবশ্যক হইলেই ইহাদের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। অভ্যাস না থাকিলে কোন কাজই ভাল রকম সম্পন্ন করা যায় না, সেইজন্য প্রতিদিন সৈন্যদিগকে কুচকাওয়াজ্ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধাদির সাহায্য-কল্পে ভারতের নানা স্থানে অস্ত্রাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাজ্যরক্ষার জন্য সৈনিকদিগের মত নৌবাহিনীরও বিশেষ আবশ্যক। ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে অকূল সমুদ্র। বৈদেশিক শত্রু যাহাতে এই তিন দিক্ হইতে জলপথে ভারত আক্রমণ করিতে না পারে, সেইজন্য নানা স্থানে রণতরীর আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল আড্ডায় যুদ্ধ-জাহাজ ও জলযুদ্ধের সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সৈন্যগণ বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী। ইংরাজদিগের মত জলযোদ্ধা পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহাদের জলযুদ্ধের আড্ডা এমনই কৌশলে রক্ষিত যে, কেহ অলক্ষিতভাবে বা শত্রুভাবে সেখানে সহজে উপস্থিত হইতে পারে না। এই সমস্ত স্থানে যুদ্ধোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। কলিকাতা ও ডায়মণ্ড হারবারে যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌসৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

নৌবাহিনী।

পূর্ব্বে আমরা পুলিশের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। এই পুলিশই প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার ভার এই পুলিশের উপরই ন্যস্ত। গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে এই পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা থাকায় সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। কোন স্থানে কোন প্রকার অশান্তি বা উদ্বেগের আশঙ্কা হইলেই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয় ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করে। প্রতিজিলায় পুলিশের যিনি কর্ত্তা থাকেন তাঁহাকে ডিষ্ট্রিক্ট্ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বলে। তাঁহাকে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। প্রতিজিলায় এই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টার ও সাব্-ইন্‌স্পেক্টার থাকেন। জিলার মধ্যে কোথাও চুরি, ডাকাতি বা খুন হইলে তাঁহারা তাহার তদন্তের ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত পুলিশ-গ্রহণীয় যে কোন অভিযোগের তদন্ত তাঁহারাই করেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা ও যত্নে অপরাধী ধৃত হইয়া বিচারে শাস্তি পায়। দেশে যদি এই পুলিশের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে দেশে কিছুতেই নিরাপদ্ হইতে পারিত না। এই পুলিশের যিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা তাঁহাকে ইন্‌স্পেক্টার-জেনারেল বলে।

পুলিস কমিশনার। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট।

পুলিশ সম্বন্ধে কলিকাতার নিয়ম অন্য রকম। কলিকাতার পুলিশ বাঙ্গালার পুলিশ হইতে পৃথক্। কলিকাতা-পুলিশের বড় কর্ত্তাকে পুলিশ কমিশনার বলে। কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিয়া সকলের নিকট

পরিচিত। তাঁহার ক্ষমতা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে কোন কোন অংশে অধিক। শাসন-বিভাগের মত বিচার-বিভাগেও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

নবম অধ্যায়

বিচার-বিভাগ।

আইন।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষে যে কত দিক্ দিয়া কত প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা এক এক করিয়া সমস্ত বলিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে এই সময় দেশে যে প্রকার সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আর কোন সময় সে প্রকার হয় নাই। দেশে প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শাসকসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য দেশের ও সমাজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা। ইংরাজশাসনে ইহা সম্পূর্ণ-ভাবে করা হইয়াছে। ভারতবাসীর ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজ আমলে নানা প্রকার আইন-কানুন প্রস্তুত হইয়াছে। এই শাসনে কোথাও কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা পক্ষপাতিত্ব নাই। আইনানুসারে সমানভাবে সকলকেই শাসন ও রক্ষা করা হইতেছে। পূর্ব্বে চোর ডাকাতগণ নিজেদের দল পুষ্ট করিয়া অবাধে লোকের ধনপ্রাণ হরণ করিত। এখন আর সেদিন নাই। ইংরাজরাজের কঠোর আইনে ও তাঁহাদিগের সুশাসনপ্রভাবে সেই সমস্ত অত্যাচারের অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এখন কেহ অন্যায় করিলে সহজে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না ইংরাজের

আইনে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চোর ডাকাতেরা ধরা পড়িলে, তাহাদিগকে ভীষণ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই সমস্ত কারণ দেশে আজকাল অত্যাচার অনাচারের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় দুর্ব্বৃত্ত এখনও তাহাদিগের অত্যাচার-লিপ্সা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই তাহারাও সর্ব্বদা পুলিশ প্রহরিগণের ভয়ে জড়সড়।

ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির বাস। তাহা-দিগের সকলের সামাজিক রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা দুষ্কর। বিশেষতঃ, ইংরাজগণ যখন এদেশে প্রথম শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন এই দেশের লোক ও তাহাদিগের সমাজবিধি তাঁহাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কিন্তু তবুও তাঁহারা আইন প্রণয়নে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মের মর্য্যাদা এমন সুন্দর উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন যে ভাবিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য স্বতন্ত্র আইন তৈয়ার করিতে পারিতেন, কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্তৃপক্ষগণ সে নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন নাই। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বিদ্বেষভাব কিংবা বাদবিসংবাদ হইতে পারে, তাঁহারা আদৌ তেমন কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যবস্থাগুণে

সকল ভারতবাসীই স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত রীতিনীতি ও কর্ম্মে আস্থাবান্ থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দেশের আইন তাঁহাদিগের এই কার্য্যে কোন প্রকার বাধা না দিয়া বরং সাহায্য করে। ইহাই ইংরাজ শাসনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদিগের আইন-কানুন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। যে সমস্ত ব্যবস্থা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, আইন প্রণয়ন কালে ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষ আপত্তিজনক না হইলে, তাহা পরিবর্জ্জন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব তাহা আমূল রক্ষা কয়িয়া এই দেশীয় লোকের শাস্ত্র ও অনুশাসন প্রণালীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহারা এই দেশের জেতা হইলেও প্রজাদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, বিবেক ও চির-প্রচলিত আচার-পদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অযথা মনঃক্ষুণ্ণ করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা আইন প্রণয়ন কালে জেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু ভারত বাসীকে জেতা জাতির সমকক্ষ করিয়া ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সরকারী কার্য্যে নিয়োগ বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে

যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিত, ইংরাজদিগের শাসনগুণে তাহার তীব্রতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। এখন সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষার সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন হিন্দু দেব-মন্দিরে বসিয়া নিরুদ্বেগে উপাস্য দেবতার পূজা করিতে পারেন। মুসলমানগণও আপনাদিগের মসজিদে বসিয়া মুসলমানধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতিক্রমে ধর্ম্মোপাসনা করিতে পারেন। দেশের আইনের গুণে কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না।

ভারতবাসী কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ে সমান অধিকার লাভ করিয়াছে এমন নহে, তাহারা শাসন-কার্য্য সম্পর্কেও সমান অধিকার পাইয়াছে। এই বিষয়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে ভারতবাসী ক্রমে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়া ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

দেশকে উন্নত করিতে হইলে, দেশে প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। ইংরাজরাজ সেই ধর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন আদালতের প্রতিষ্ঠা ও বিচারক নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই সকল আইন আদালতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিচারক ধর্ম্মাবতার, তিনি

আইন আদালত ও বিচারক।

আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অপরাধের তারতম্য অনুসারে দোষীর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইংরাজ রাজত্বের বিচারকগণ সাধারণতঃ কাহারও কোন প্রকার অনুরোধ বা উপরোধের বশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। উৎকোচ বা অন্য কোন স্বার্থমূলক প্রলোভনকে তাঁহারা বিষবৎ পরিবর্জ্জন করেন। তাঁহারা সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিচার-কার্য্য কোন প্রকারেই পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট হইতে পারে না। তাঁহারা বিচারকার্য্যে স্বাধীন হইলেও ক্ষমতায় ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষের অধীন। তাঁহাদের বিচার এবং কার্য্যা-বলী পরিদর্শন করিবার জন্য আবার উচ্চ বিচারালয়ে বিচারক আছেন। কোন কোন সময়ে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ইংরাজ রাজত্বের ছোট বড় সকল বিচারক নিজ নিজ কার্য্যের জন্য ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দায়ী। সুতরাং কোন বিচারকই কোন সময় বিচারাসন কলঙ্কিত করিতে সাহসী হয়েন না।

আসামী গ্রেপ্তার।

ইংরাজ আমলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য এমন কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, রাজাও বিনা বিচারে প্রজাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। ইতঃপূর্ব্বে কোন রাজত্বের সময় এই

প্রকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কোন প্রজা ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত হইলে দেশের আইনানুসারে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে যে কেহ গ্রেপ্তার করিতে পারে না। তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ চাই। তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক করিয়া রাখিবার উপায় নাই। তাহাকে আদালতে হাজির করিতেই হইবে। হাজির না করিয়া কোন আসামীকে আবদ্ধ রাখিবার নিয়ম নাই। বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে আদালতে আসামীর বিচার হয় সেখানে সকলেই গমনাগমন করিতে পারে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও কোন বিচারক সকলের সমক্ষে কোন প্রকার অন্যায় বিচার করিতে সাহস করেন না। বিচার-সময়ে আসামী নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। সাধারণতঃ

ওয়ারেণ্ট্।

ইংরাজরাজের কোন প্রজাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিনা আদেশে গ্রেপ্তার করা যায় না বটে, কিন্তু, কতকগুলি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত ও ধরা যায়। এইরূপে ধৃত করিলেও তাহার অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আইনের চক্ষে সে নিরপরাধ বলিয়া গণ্য।

বিচারে জুরীর প্রথা প্রবর্ত্তিত করা ইংরাজ-শাসনের

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহার প্রবর্ত্তনে কত লোকের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়। কোন অপরাধের আসামীশ্রেণীভুক্ত হইলেই পূর্ব্বে দণ্ডিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ইংরাজ-রাজের সাম্য-নীতিমূলক শাসনে এখন প্রজার এই প্রকার কোন আশঙ্কা নাই। গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিও দায়রার বিচারে জুরীগণের সহায়তা পায়। পাঁচজন, সাতজন কিংবা অবস্থাভেদে নয়জন লোক লইয়া জুরী গঠিত হয়। তাঁহারা বিচারকের সহিত বিচারালয়ে বসিয়া অপরাধীর অপরাধের বিচার করেন। বিচারে কোন প্রকার গুরুতর ভুল না হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি অনর্থক শাস্তিভোগ না করে, এই জন্যই এদেশে জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাস্তবিক, এই প্রকার বিচারের সুব্যবস্থা ভারতবাসী পূর্ব্বে কখনও লাভ করে নাই। হাইকোর্টের ও বড় বড় জিলার দায়রার বিচারে এই জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন কোন ছোট জিলাতে এখনও জুরীনিয়োগের ব্যবস্থা হয় নাই। সে সকল স্থানে জজ্ সাহেব "এসেসর" দিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। 'এসেসর'গণ হইতে জুরীগণের ক্ষমতা অনেক অধিক। জুরীর অধিকাংশের অভিমতে আসামী অব্যাহতি পাইতে পারে। "এসেসর"

জুরী প্রথা।

এসেসর।

গণের অভিমতের বিরুদ্ধেও জজ্ সাহেব তাঁহার নিজের বিশ্বাসানুসারে কাজ করিতে পারেন। জুরী ও জজের মতদ্বৈধ ঘটিলে মোকর্দ্দমা বিচারার্থ হাইকোর্টে প্রেরণ করা হয়। জুরার ও 'এসেসর'গণ নিরপেক্ষ লোক; তাঁহারা স্বাধীনভাবে অভিমত প্রদান করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট এ ক্ষেত্রেও এই দেশবাসিগণের ক্ষমতা ও বিচারশক্তির উপর জটিল মোকর্দ্দমার ভার ন্যস্ত করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

জজ্।

বিচারবিভাগে জিলার জজ্ সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটিগণের আপীলেরও বিচার করেন। প্রত্যেক জিলায় দেওয়ানী কার্য্যের জন্য মুন্সেফ আছেন। তাঁহারা জমিদারের খাজনা বা ভূমি ও টাকার আদান প্রদান সম্বন্ধে সত্যাসত্যের বিচার করেন। জিলার জজের নিকট এই মুন্সেফ্‌গণের বিচারেরও আপীল হইতে পারে। কার্য্যের আধিক্য অনুসারে প্রতি জিলায় এক বা ততোধিক সাব্-অর্ডিনেট জজ্ নিযুক্ত হন। মুন্সেফগণের আপীল তাঁহারাও শ্রবণ করিতে পারেন। জজের নিকট বড় বড় দেওয়ানী মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে। অনেক জিলাতে জজ্ সাহেব দায়রার বিচার করেন।

কার্য্যাধিক্য বশতঃ অবস্থাভেদে স্বতন্ত্র সেসন্ (দায়রার) জজও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। জিলার মুন্সেফ্‌রা সাধারণতঃ হাজার টাকার দাবীর দেওয়ানী মামলার বিচার

করেন। কোন কোন স্থলে তাঁহারা দুই হাজার টাকার দাবীর মামলাও গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণ মামলার বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সী টাউন ও মফঃস্বলে 'স্মল কজ্ কোর্ট' বা ছোট আদালত আছে। সাধারণতঃ অবস্থাভেদে প্রতি জিলাতেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য জিলা জজ্, অতিরিক্ত জিলা জজ্, সব্ জজ্, মুন্সেফ্, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সব্‌ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ আছেন।

স্মল কজ্ কোর্ট বা ছোট আদালত।

মানুষমাত্রেরই ভুল হইতে পারে। এই সকল বিচারকেরও ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, অনেক সময় আইনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হয় না। অথচ, কোন আইনের নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে কোন পক্ষের হয়ত বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। এই জন্য প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী উচ্চ বিচারালয় বা হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। হাইকোর্টে যে বিচার হয়, তাহাই এ দেশের শেষ বিচার। হাইকোর্টে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমারই আপীল হইয়া থাকে। আইনানুমোদিত যে কোন দণ্ড হাইকোর্ট বিধান করিতে পারেন। ডিষ্ট্রিক্ট জজও অবশ্য আইনসঙ্গত সর্ব্বপ্রকার দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন বটে, তবে মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হওয়া

হাইকোর্ট।

আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দায়রা আদালতে জুরী বিচার কার্য্যে জজ্‌কে সাহায্য করিয়া থাকেন। দায়রার জজ্ যদি মনে করেন যে জুরিগণ অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তবে তিনি ঐ মত হাইকোর্টে জানাইতে পারেন। হাইকোর্ট ঐ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য বা রূপান্তরিত করিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারকালে নয় জন জুরী থাকেন। উঁহারা যদি একমত হন, তাহা হইলে বিচার-পতির সে বিষয়ে সম্মতি না থাকিলেও জুরিগণের মতই গ্রহণীয় হয়। সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেল বা যে প্রদেশে ঐ ঘটনা ঘটে, সেই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন। হাইকোর্টে বিচারে কোন প্রকার বে-আইন কাজ হইতে পারে না। এই বিচারের পরেও যদি কোন পক্ষ সন্তুষ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে সেই পক্ষ হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধেও বিলাতে আপীল করিতে পারেন। ইহাকেই লোকে বিলাত বা "প্রিভিকাউন্সিল্" আপীল কহে।

রাজপ্রতিনিধির দয়া।

প্রিভিকাউন্সিল।

যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোনপ্রকার অবিচার না হয়, চোর, দস্যু, নরঘাতক প্রভৃতি দুর্বৃত্তদিগের প্রতিও ন্যায়বিচার প্রদর্শিত হয়, সেইজন্য ইংরাজ-রাজ বিচারালয়ে বিচারের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই তাঁহা-দিগের প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

বিচারকার্য্যে সহায়তার জন্য বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষে উকিল বা মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়া বিচারকের নিকট আইন ও অবস্থাঘটিত বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই সকল উকিল ও মোক্তারগণকে গবর্ণমেণ্ট গৃহীত আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। উকিল ও মোক্তার ব্যতীত আর এক শ্রেণীর আইনব্যবসায়ী আছেন, তাঁহাদিগকে ব্যারিষ্টার বলে। উহাঁরা বিলাত হইতে আইনের পরীক্ষায় পাশ করিয়া এদেশে আসিয়া থাকেন। আইনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্যাপার পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ভালরূপ জানা থাকে। সুতরাং আইনের চক্ষে ধূলা দিয়া বিচারে কাহারও প্রতি কোন প্রকার অন্যায় করা সহজসাধ্য নয়।

উকিল ও ব্যারিষ্টার।

পূর্ব্বে অপরাধীর প্রতি পৈশাচিক দণ্ডের বিধান করা হইত। সামান্য অপরাধে মাথা কাটা, শূলে দেওয়া এবং কুকুর দ্বারা খাওয়ানর ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন অবস্থায় হাত কাটা, পা কাটা, চক্ষু তুলিয়া ফেলা প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা হইত বলিয়াও শুনা যায়। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই ; সুসভ্য ইংরাজ জাতির শাসনে এই সমস্ত লোমহর্ষণ দণ্ড রহিত হইয়াছে। এদেশে এখন অপরাধ করিলে লোকের অবস্থা ভেদে জরিমানা, বেত্রাঘাত, জেল, নির্ব্বাসন ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধের দণ্ড ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারে। হত্যাকারী ও রাজদ্রোহী ব্যতীত আর কাহারও

অপরাধীর দণ্ড।

প্রতি ফাঁসির ব্যবস্থা হয় না। চোর ও দস্যুদিগের জেল, নির্ব্বাসন বা বেত্রাঘাত হয়। লোকের উপকারের জন্যই এই সকল ব্যবস্থা হইয়াছে; ইহাতে নিষ্ঠুরতা নাই। আবার অপরাধীর স্বাস্থ্যানুযায়ী শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। জেলপ্রথা এদেশে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত।

জেল। কিন্তু সেই সময়ে জেলখানাগুলি দূষিত বাষ্পময় অন্ধকার গিরি-গহ্বর বিশেষ ছিল। সেস্থান মানুষের বাস করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জেলখানা এখন স্বাস্থ্যের সম্যক উপযোগী হইয়াছে। জেলখানার কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতিও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহাদিগের গুণে সেখানে কঠোরতার মধ্যেও দয়া আছে, নৃশংসতায়ও করুণা আছে। জেলখানার রোগী কয়েদীদিগের শুশ্রূষার জন্য হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে এবং ঔষধ-পত্র ও পথ্যের ব্যবস্থা আছে। সেখানে কেহ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে না, কয়েদীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি-পত্র লিখিতে পারে। আবার আত্মীয়েরাও তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেও চিঠি-পত্র লিখিতে পারে। রাজ-বিধানে সেখানেও

রিফর্ম্মেটরী। ছয় দিন পরিশ্রম করিবার পর রবিবারে বিশ্রামের নিয়ম আছে। কয়েদীরা যদি জেলখানায় কোন প্রকার আইন-বিগর্হিত অন্যায় আচরণ

না করে, তাহা হইলে তাহাদের শাস্তির লাঘব করিবারও ব্যবস্থা আছে। অল্পবয়স্ক বালক কয়েদীদিগের লেখাপড়া ও চরিত্র সংশোধনের জন্য জেলে স্কুল আছে; এই স্কুলে তাহাদিগকে ভবিষ্যজ্জীবনোপযোগী নানা বিষয়ের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। জেল হইতে মুক্তি পাইলে এই শিক্ষার গুণে তাহারা আবার চুরি ডাকাতির মত অপরাধ না করিয়াও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে।

দশম অধ্যায়

ইংরাজ শাসনের ফল।

সে আজ প্রায় ১৬৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা, যখন ইংরাজ প্রথম এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন; সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত ভারতের নানাদিক দিয়া নানাপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং যতই দিন যাইতেছে, ভারত ততই উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। এখন আর সে ভারত নাই। ভারতের অরাজকতা, বিপ্লব বা অশান্তি এখন কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজের সুশাসন-গুণে দেশ হইতে চোর দস্যুর ভয়, লোকের ধন ও কথায় কথায় প্রাণনাশের আশঙ্কা একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। এখন আর বর্গীর ভয়ে বাঙ্গালীকে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হয় না। পূর্ব্বে যেমন জলদস্যুর ভয়ে সমুদ্র ও নদীর তীরবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত, এখন আর তাহাদিগের তেমন কোন আতঙ্ক নাই। রাজ্যে এখন সর্ব্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজের শাসন ও সুব্যবস্থার গুণে এখন আর ভারতবাসীকে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণেও অতিষ্ঠ হইতে হয় না। এই শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিশ্চিন্তভাবই ইংরাজ রাজত্বের বৈশিষ্ট্য।

ইংরাজ জাতি আমাদের দেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার পর কত স্থানে কত নূতন নগর, উপনগর, বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কত সহরে কত রাজপথ নির্ম্মিত হওয়ায় লোকের গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। এই সময় ইংরাজরাজের চেষ্টায় ও যত্নে অনেক প্রাচীন জীর্ণ শীর্ণ সহর সুন্দর নগরে পরিণত হইয়াছে। যে স্থানে পূর্ব্বে মানুষের বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, হিংস্র বন্য জন্তু পরিপূর্ণ বিরাট অরণ্যানী ছিল, সেই স্থানে এখন নয়নাভিরাম গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক পুরাতন পূতিগন্ধময় জলপূর্ণ জলাশয়কে স্বচ্ছ সুপেয় জলপূর্ণ সরোবরে পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য ছিল, বর্ত্তমানে ইংরাজের উদ্যোগে শীঘ্রগামী যানাদির সাহায্যে সে সকল স্থান অতি সহজগম্য হইয়া পড়িয়াছে; উহাদিগের চেষ্টায় ডাক ও টেলিগ্রাফের প্রবর্ত্তন হওয়ায় লোকের দূর দূরান্তরের সংবাদাদি আদান-প্রদানের যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক সম্প্রদায়ের লোক ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত করিত বটে, কিন্তু অনেক সময় ঠগ, প্রবঞ্চকদিগের জ্বালায় তাহাদিগকে অতিষ্ঠ হইতে হইত। কাজেই তাহারা বিনা বাধায় ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে পারিত না। ফলে, অনেক সময় ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইত। কিন্তু

ইংরাজরাজের সুব্যবস্থায় দেশে ঠগ প্রবঞ্চকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে এবং দিন দিন ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে। উহাদের সুশাসনে ও নানাপ্রকার বিধি ব্যবস্থায় দেশে জিনিষ আমদানী-রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পূর্ব্বে এ দেশের কোথাও কোন সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সেই স্থানের অধিবাসিবৃন্দকে অভাব অনটনের জ্বালায় বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত এবং অনেককে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময় দেশের কোথাও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে দ্রুতগামী যানাদির সাহায্যে অন্য প্রদেশ হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ করিয়া লোকের দুঃখ কষ্টের লাঘব করা হয়। সাধারণতঃ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, জলপ্লাবন, অজন্মা প্রভৃতি কারণের জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অনেক সময দেশে আবশ্যকাতিরিক্ত খাদ্যশস্য না জন্মিলেও ইহা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তাহাতে অনেক সময় দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়া থাকে। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ দুর্ভিক্ষের এই সমস্ত মূলীভূত কারণ দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাঁহাদিগের চেষ্টায় কোথায়ও কোন সময় দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে না। অনেক সময় সরকার পক্ষ হইতেও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্য করা হয়।

ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের জন্য তাহারা সকল প্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিতে পারে। পূর্ব্বে এই দেশে ধর্ম্মের জন্য সম্প্রদায়বিশেষকে কত সময় যে কত প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছে, সেই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করিতে হইলে মহাভারতের মত একখানা বিরাট্ গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের সুশাসনে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ই আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কাজ করিতে পারে। কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না। বাধা দিতে চেষ্টা করিলেও দণ্ডিত হইতে হয়। ফলে, এখন কোন ধর্ম্মই অন্য কোন ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিয়া তাহার ধ্বংসের চেষ্টা কবিতে সাহস করে না। আজ ভারতবাসী ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া মহাসুখে দিন যাপন করিতেছে। আজ খৃষ্টান নির্ভয়ে গির্জ্জায় বসিয়া ভজনা করিতেছে, হিন্দুগণ শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া দেবালয়ে দেবার্চ্চনা করিতেছে, মুসলমানগণ মস্‌জিদে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে নমাজ পড়িতেছে। কাহারও কোন প্রকার ভয় কিংবা শঙ্কা নাই। সকলেই জানে, ব্রিটিশরাজের অপ্রতিহত ক্ষমতা তাহাদিগকে সকল প্রকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। সেইজন্য কাহাকেও কোন প্রকার চিন্তা করিতে হইবে না।

আইন-প্রণয়নে ইংরাজগণ অপরিসীম মনস্বিতা, গভীর বহুদর্শিতা, প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন

করিয়াছেন। তাঁহারা এই আইন-প্রণয়নের সময়েও এদেশ-বাসীর প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেকের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিরোধে সম্পন্ন হইতে পারে, আইন-প্রণয়ন করিবার সময় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তাঁহারা আইন-প্রণয়নকালে জেতা-বিজেতা সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া সকলকেই সকল বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অপরাধ করিলে সকলের জন্যই আবার সমান দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সর্ব্বজনপূজিত স্বর্গগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ও প্রজাগতপ্রাণ ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণা পত্রে বলা হইয়াছে যে ভারতবাসী শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত হইলে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার, পদ এবং গৌরব প্রদান করা হইবে। ভারতবাসী যতই শিক্ষিত হইতেছে, যতই তাহাদের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে, সেই অনুসারে ততই তাহাদিগকে অধিকার ও পদমর্য্যাদা প্রদান করা হইতেছে। এ বিষয়ে ইংরাজ কখনও কোন প্রকার কার্পণ্য বা কথার অন্যথা করেন নাই।

ভারতবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য ইংরাজদিগকে যে প্রকার পরিশ্রমসহকারে বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন গবর্ণ-

মেণ্ট্কেই ততটা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। তাঁহারা ভারতবাসীকে জীবিকার্জ্জনসম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষাদান হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কীয় জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্প শিক্ষার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। মহাজনের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যৌথ মহাজনী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কুসীদজীবী মহাজনদিগের, অত্যাচারী জমিদারের উৎপীড়ন নিবারণের জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বনভূমি রক্ষা, খনির কার্য্য, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা-শিক্ষার ব্যবস্থা, জলসংস্থানের উপায়, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, রাজপথ, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, দাসত্ব ও শিশুহত্যা নিবারণ, জমি জরিপ ও মাপ প্রণয়নের সঙ্গে স্বায়ত্ত শাসন ও জুরী প্রথা প্রবর্ত্তন, কল কারখানা প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা, প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক প্রকার কার্য্যে তাঁহাদিগকে ভারতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে।

শিক্ষাবিষয়ে ইংরাজজাতি এদেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সমন্বয় করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে ভারতবাসীর পক্ষে এখন সকল প্রকার শিক্ষাই সহজসাধ্য হইয়াছে। তাঁহারা এই শিক্ষার প্রভাবে আজকাল

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতিতে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া জগতের পূজনীয় ও বরণীয় হইয়াছেন। প্রধানতঃ শিক্ষার সহায়তায় যতদূর উন্নতি সম্ভব, ভারতবাসী ইংরাজরাজত্বে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষায় ভারতের বদ্ধমূল কতকগুলি কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে। আমরা এখন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী, উত্তম আলোক, বায়ু, মুক্তস্থানে অবস্থান, সংশোধিত জল পান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি। নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর যে কুৎসিত আচরণ, ঘৃণা বা বিদ্বেষ এতদিন ভারতে স্থান পাইয়াছিল, তাহা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণে, সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। এখন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই সকলকে প্রীতি ও ভালবাসার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন। এখন সকলের মধ্যেই একটা সহৃদয়তার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সঙ্কীর্ণ শিক্ষার স্থানে উদার ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনই যে ইহার মূল কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষাদ্বারা রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভাষা অনেকাংশে উন্নত হইয়া থাকে। এই দেশে ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে প্রাদেশিক ভাষার, বিশেষতঃ বঙ্গভাষার, প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। অবশ্য, এই

শাসনের প্রথম যুগে নব্য ইংরাজীশিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি একটু বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সে ভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই ইংরাজী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মানুষকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করে। প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে যে, জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন করা বিশেষ আবশ্যক তাহা ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এইদিকে অবিহিত হইলেন। সেইজন্য রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রমেশচন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আজকাল বঙ্গভাষা বিশেষভাবে উন্নত হইয়াছে। এখন অনেকেই এইভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা গৌরবের বিষয় মনে করেন। মার্শম্যান্, ক্যারী প্রভৃতি ইংরাজ পাদরীগণ প্রথমে বঙ্গভাষায় অভিধানাদি সঙ্কলন করিয়া এই ভাষার পরিপুষ্টির পক্ষে সহায়তা না করিলে আজ ইহা এই প্রকার গৌরব লাভ করিতে পারিত না। এইজন্যই তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহারাই "সমাচার দর্পণ" নামক সপ্তাহিক পত্রিকা বঙ্গভাষায় প্রথম বাহির

করেন। শ্রীরামপুরের ইংরাজ পাদরীগণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম এদেশে আসে। তাঁহারা প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষরে বঙ্গভাষার প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বাহির করেন। এই সদাশয় ইংরাজগণের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহাদের সহায়তায় ও যত্নে ক্রমে ক্রমে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের অভাব ঘুচিয়া গিয়াছে। কাষ্ঠের অক্ষরের পরিবর্ত্তে এক্ষণে মুদ্রণকার্য্যে সীসার অক্ষর ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাও ইংরাজ শাসনেরই বৈশিষ্ট্য।

এদেশে ইংরাজশাসনের একটা মহীয়সী কীর্ত্তি সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা করা। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিতদিগের অভাব, অভিযোগ, আদেশ বা বক্তব্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার কোন সহজ পন্থা ছিল না। ইংরাজদিগের অধ্যবসায় ও যত্নে সেই অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। এখন আমরা সংবাদপত্রের সাহায্যে আমাদের অভাব ও অভিযোগ শাসকদিগকে সহজেই জানাইতে পারি। তাঁহারাও সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহাদের আদেশও ব্যক্তব্য প্রজাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে পারেন। এইজন্য কোন পক্ষকেই কোনপ্রকার প্রয়াস পাইতে হয় না।

ইংরাজ আমাদিগকে অনেক জিনিষ প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই দান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা জুরী-প্রথার কথা বলিতে পারি। যাহাতে জুরীর সাহায্যে আদালতে বিচার হয়, সেই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে ইংরাজ-

জাতিকে তাঁহাদিগের স্বদেশে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা যখন একবার এই প্রথার উপকারিতা নিজেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তাহা আমাদিগকে দিতে কোন প্রকার কার্পণ্য করেন নাই। জুরীসম্বন্ধে আমাদিগের যখন কোন প্রকার ধারণাই ছিল না, তখন তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সেই প্রথা আমাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহাতে যে আমরা কতদূর উপকৃত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। এই ভাবেই ইংরাজ-শাসকগণ আমাদিগকে অনেক নূতন আদর্শ, অনেক নূতন পন্থা, অনেক নূতন কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিয়াছেন। যখনই লোক কোন কিছুর অভাব অনুভব করে, তখনই তাহা পাইবার জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণের ভিতরে জাগিয়া উঠে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ইংরাজদিগের উদারতায় আমরা যখন কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তাহা আরও পাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। ইংরাজ আমাদিগের মধ্যে এই প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ক্রমে আমাদিগের মধ্যে স্বত্ব অধিকার বোধ এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আজ কাল দরিদ্র কৃষাণ, নিঃস্ব কুলিমজুর পর্য্যন্ত জানে যে তাহাদেরও কোন না কোন স্বত্ব বা অধিকার আছে। যথাস্থানে আবেদন করিলেই তাহারাও সেই স্বত্ব অধিকার লাভ করিবে। কেহ তাহাদিগকে সে বিষয়ে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

তাহারা জানে ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে কিংবা কেহ কাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে না ; করিলে তাহাকে সকল অবস্থাতেই দণ্ডিত হইতে হয়। এই ভাবেই আজকাল সকলের মধ্যেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আর কেহ কোন বিষয় না বুঝিয়া মানিয়া লইতে চাহে না। সকলের মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের ভালমন্দ দুইদিক্ বিচার করিবার শক্তি জন্মিয়াছে। সকলেই এখন অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত স্বত্ব অধিকার প্রাপ্তির জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। কোন বিষয়ে কোন স্থানে কাহার সহিত অধিকার সম্পর্কে তারতম্য দেখাইলে লোকে মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে। এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে অধিকারপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহাও ব্রিটিশশাসনের ফল। কেহ কেহ বলেন যে সামাজিক হিসাবে এই জাতীয় উদ্দীপনা কল্যাণজনক নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়াও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজশাসনে প্রজাবৃন্দের চিন্তাশক্তি ও কার্য্যক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বত্ব অধিকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের বিজ্ঞান, ইউরোপের দর্শন লোকের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে, নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। তাহাদিগের সম্মুখে অর্থোপার্জ্জনেরও নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তাহারা

মন্ত্রিসভা, ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির কার্য্য সম্পাদনের অধিকার পাইয়া সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধা পাইয়াছে। এইভাবে তাহাদিগের মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উন্মেষ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ইংরাজশাসন সমাজকে সংস্কৃত, স্বদেশকে উন্নত ও স্বজাতিকে গৌরবান্বিত করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে জাগরিত করিয়া তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের বীজ বপন করাই ইংরাজশাসনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইজন্য শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণ ও জনসাধারণ উভয়েই গৌরব অনুভব করিতে পারেন। ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ; উহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। ইংরাজ-শাসনে এই বিভিন্নতা দূর হয় নাই বটে, কিন্তু, তাঁহাদিগের অধিকারে ভারতবাসী একই শিক্ষা, একই শাসনতন্ত্র, একই আইন, একই আদর্শের অধীন হওয়ায় তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একটা একতার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে এই একতাভাব প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন— ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের ভাব, তাঁহাদিগের চিন্তা, তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষার গতি একই পথে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিবিধ

সামাজিক ভেদ থাকা সত্ত্বেও হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান একত্র বসিয়া, একত্র মিলিয়া আপনাদের যাহাতে কল্যাণ হয়, দেশের যাহাতে উন্নতি হয়, সেই সম্বন্ধে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতেছেন। নানাবিধ ভেদ থাকা স্বত্ত্বেও যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বেশভূষাধারী, বিভিন্ন-ভাষাভাষী, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ সাধারণ হিতসাধনের জন্য একস্থানে সম্মিলিত হয়েন, তখন ভারতবর্ষে যে এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের সুব্যবস্থাই যে এই মহাজাতি প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই প্রকারে যেদিক্ দিয়াই দেখি না কেন, ইংবাজ-জাতি ভারতবর্ষে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। সেইজন্য ভগবৎসমীপে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমাদের দেশে ইংরাজশাসন যেন চিরদিন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমরা যেন তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সুশাসনের গুণে স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে পারি। আমরা জানি, প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি—যেদিন আমরা স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইব, সেদিন ইংরাজজাতি কিছুতেই আমাদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চি না—করিতে পারেন না, ইহা যে সম্রাটের বাণী।

সমাপ্ত